কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
শ্রীবিগ্রহের
অদ্ভুত মহিমা

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিগ্রহের অদ্ভুত মহিমা
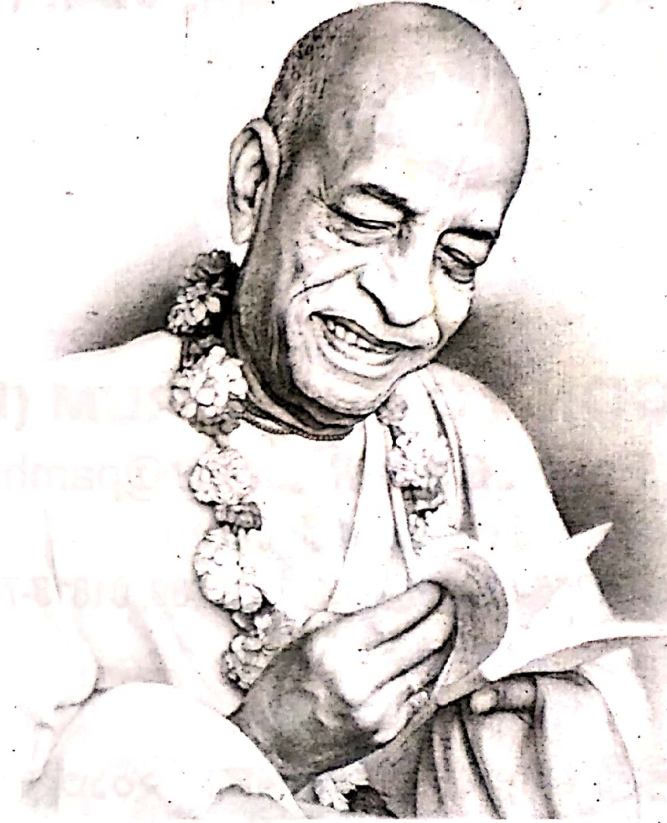
উৎসর্গীকৃত

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

শ্রীবিগ্রহের অদ্ভুত মহিমা

সংকলনে ঃ

ইস্‌কন ইয়ুথ ফোরাম, চট্টগ্রাম

Contact

ISKCON YOUTH FORUM (IYF)

Mail : Pandit.Gadadhar.JPS@pamho.net

www.iyfctg.com

Mobile : 01815-628852, 01845-812889, 01818-768236

প্রথম প্রকাশ ঃ

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা - ২০১৩ইং

৫০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ সপ্তর্ষী গ্রাফিক্স ইন্‌

জি.এ.ভবন, ইউনিট # ৫, ২য় তলা, আন্দরকিল্লা।

০১৮১২-০৯৯৩৬৩, sdgraphline@gmail.com

ঃ নির্দেশক ঃ

শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

সেক্রেটারী, জিবিসি, ইস্‌কন।

ঃ কৃতজ্ঞতায় ঃ

শ্রীপাদ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীপাদ বেণুধারী দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীপাদ অনঙ্গ মোহন দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীপাদ জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীপাদ লীলারাজ গৌরদাস ব্রহ্মচারী

ঃ অনুপ্রেরণায় ঃ

শ্রীমান মিত্রগোপা কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমান দেবর্ষী শ্রীবাস দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমান বিষ্ণুচরণ দাস ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

শ্রীশ্রী মদনমোহন

শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীশ্রী মদনমোহন বিগ্রহ

সর্ব্বধাম শিরোমণি ব্রজধাম ; তাঁর মধ্যে গোকুল মহাবন। যেখানে স্বয়ং বৃন্দাদেবী প্রকট হয়ে গগন, পবন, নদী, সরোবর, নগর, বনস্পতি, বল্লরী, খগ ও মৃগাদিকে নব সাজে নিরন্তর সাজিয়ে রেখেছেন ; বসন্ত পবনকে প্রবাহিত করিয়ে নিরবধি যেন সেই ধামকে শান্ত সুশীতল করে রেখেছেন ; নবদলে, নব-ফুলে সর্বকাল বনরাজিকে যেন সুশোভিত করে রেখেছেন; বনভূমির কোথাও কেতকী, যাতী, যুঁই, মল্লীকা, মালতী-গন্ধে এবং কোথাও সুনির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর-নিকরে প্রস্ফুটিত সরোসিজ গন্ধে, শ্রীশ্রীরাধা মাধবের সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখবিধান করছেন; পুঞ্জীভূত পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ বল্লরী সকল মনোহর কুঞ্জরূপে বনস্থলীর যেন শোভাবর্দ্ধন করছেন ; কোথাও জটাজাল বিস্তৃত ঋষিকূলের ন্যায় বট-বৃক্ষাদি অচল অটল ভাবে শোভা পাচ্ছেন ; কোথাও বন-

ভূমিতে পুষ্প কুঞ্জসমূহ অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করছেন, ভ্রমর-ভ্রমরীগণ পুঞ্জ-পুঞ্জ-মঞ্জুল-পুষ্প বনে গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। ময়ূর-ময়ূরীগণ নৃত্যকলা বিস্তার করতে করতে কাননে কাননে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে; তরু সঙ্গে তরু শাখায় শাখায় কোকিল কুলরা আকুল প্রাণে গান করছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করে কাশীধাম থেকে শ্রীসনাতন গোস্বামী এসেছেন মধুর শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে। শ্রীবৃন্দাবন ভূমির স্পর্শে, বনানীর সৌন্দর্য্য দর্শনে, স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্য ধারা আস্বাদনে প্রাণ ভরে গেছে, তথাপি মহাপ্রভুর বিরহে শ্রীসনাতনের প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে। মনে জাগছে একদিন কাশী ধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে, কত প্রণয় ভরে মধুর মৃদু সুহাস্য বদনে শ্রীগৌরসুন্দর যে আদেশ করেছেন, সেই আদেশটি কি ? সে আদেশ এই-

> "তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার।
> মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
> বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
> ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥"
>
> -(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩/১০৩-১০৪)

ব্রজের নিত্য বিহারশীল শ্রীগোবিন্দ কোথায় কিভাবে আছেন?

পুনঃ তাঁদের সেবা কি করে প্রকাশ হবে? কি করে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হবে? ইত্যাদি চিন্তায় বিভোর।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজবাসিগণকে সাক্ষাৎ শ্রীনন্দ-যশোদার পরিকর স্বরূপে দর্শন করতেন এবং সেই জ্ঞানে তাঁদের সেবা করতেন। তিনি শ্রী গোকুল মহাবনে একটি কুটীর করে তাতে ভজন করতেন। সর্বক্ষণ শ্রীনন্দ যশোদার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা করতেন কবে তোমাদের কৃপা পাব? কবে তোমাদের প্রাণধনের সেবা পাব।

একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী যমুনার মনোহর তটভূমি দিয়ে মাধুকরী করতে চলেছেন। ধামের মধুর শোভা, ধামের পরম দুর্লভতার কথা স্মরণে পদ-স্খলিত হচ্ছেন, মনে মনে ভাবছেন- আমি কত নির্ঘৃণ্য, দীন, অধম, তথাপি মহাপ্রভু এতবড় কৃপালু যে ধামের একটি রজঃ কণা ব্রহ্মা শিবাদি কামনা করেন, সেধামে আমার বাসাধিকার দিয়েছেন? শ্রীসনাতন গোস্বামী এরূপ ভাবছেন এবং চলছেন- আকস্মাৎ পিছনে কে ডাকলো, বাবা! বাবা!! সনাতন গোস্বামী পিছনে ফিরে দেখলেন একটি গোপ শিশু। শিশুটি কি সুন্দর শ্যামল কান্তি, শিরে কুঞ্চিত কেশ, কেশ ঝুটিকায় গুঞ্জামালা ময়ূরের পুচ্ছ, কণ্ঠে হার তাতে স্বর্ণ সূত্রে ব্যাঘ্রনখ শোভা পাচ্ছে, নয়ন ভ্রূযুগল কত সুন্দর তাতে কাজল শোভা পাচ্ছে, অঙ্গ সুঠাম

অতি সুকোমল, কটিতটে পীত ধড়া, কিঙ্কিনী দাম, চরণে নূপুর, হাতে স্বর্ণ বলয় ও মধুর হাস্য শোভিত বদনখানি।

শ্রীসনাতন শিশু দেখে অবাক। বালকটি এর মধ্যে এসে বাবা! বাবা!! বলতে বলতে শ্রীসনাতনের হাতের অঙ্গুলি ধরলেন। শিশুর বয়স ৪/৫ বৎসর হবে।

শ্রীসনাতন ব্রজবাসী বালক বালিকাদের বড় স্নেহ করতেন, কোলে নিয়ে বদন ঘ্রাণ, সর্বাঙ্গে কর সমার্দ্দন, কেশাদি বিন্যাস করে দিতেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর হাত ধরে শিশুটি কত আদর করে বলছেন-বাবা! আমি তোমার কাছে যাব। শ্রীসনাতন কথা শুনে অবাক, শ্রীসনাতন বললেন-

লালা! কি নাম তোমার ?
লালা - আমার নাম মদন।
শ্রীসনাতন - আমার কাছে কেন আসবে?
লালা - তোমার কাছে থাকব।
শ্রীসনাতন - আমার কাছে থাকবে, খাবে কি? আমি তোমার জন্য দুধ মাখন কোথায় পাব?
লালা - তুমি কি খাও?
শ্রীসনাতন - আমি শাক রুটি খাই।

লালা - আমি শাক রুটি খাব।
শ্রীসনাতন - লালা! তুমি মা বাবার কাছে যাও তোমার মা তোমাকে খোঁজ করছেন। বালকটি হাত ছাড়ে না। শ্রীসনাতন অনেক বলে কয়ে বালকটিকে রেখে দ্রুতপদে মাধুকরী করতে চললেন এবং পথে শিশুর স্নেহময় কথাগুলি স্মরণ করতে লাগলেন।

পরদিন আবার শ্রীসনাতন মাধুকরী করতে চলেছেন মনোহর যমুনার কিনার ধরে। গোপ পল্লীর একটু দূরে আবার সেই বালক ধরেছেন, "বাবা! তুমি কোথায় যাচ্ছ! আজ তোমাকে ছাড়ব না।"

শ্রীসনাতন - লালা! আমার হাত ছেড়ে দাও।
লালা - না বাবা আমি ছাড়ব না, আমি তোমার কাছে যাব।
শ্রীসনাতন - লালা! তোমার ঘর কই।
লালা - অঙ্গুলি উত্তোলন করে দূরে একটি গ্রাম দেখালেন।
শ্রীসনাতন - লালা! তুমি একা খেলছ, তোমার সঙ্গী কই?
লালা - তারা দূরে খেলছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী সেদিনও অনেক বুঝিয়ে বিদায় নিলেন, এই শিশুটি কেন আমায় ধরে? ভাবতে ভাবতে মাধুকরী করতে চললেন, ঠিক পর দিবস ঐ ঘটনা। শ্রীসনাতন অবাক, কেন আমাকে বালকটি এত মায়া করছে? একে নিয়ে কি

করব? এর মা বাবা কি মনে করবেন? লালা এদিন বললেন- বাবা! আমি কাল তোমার কাছে যাব। এদিনও শ্রীসনাতন গোস্বামী অনেক বুঝিয়ে বিদায় দিলেন।

শ্রীসনাতন স্বপ্ন দেখছেন সেই শিশুটি এসে হাত ধরে বলছে- 'আমি তোমার কাছে এসেছি'। একথা বলে হঠাৎ চলে গেল; কিছুক্ষণ পরে শ্রীসনাতনের স্বপ্ন ভাঙল। তিনি হা গৌরসুন্দর! হা নিত্যানন্দ! হা অদ্বৈত! হা গদাধর! হা শ্রীনিবাস! হা গৌরভক্তবৃন্দ বলে ভূতলে নমস্কার করলেন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর স্তোত্র সকল পাঠ করতে করতে কুটীরের দ্বার খোলেন, দেখলেন এক অপূর্ব গোপাল মুর্তি দ্বারেতে শোভা পাচ্ছে। এটি দেখে একবারেই অবাক, স্পন্দনশূন্য, এ কি? ঠাকুর দ্বারে এসেছেন?

সনাতন গোস্বামী আর প্রেমাশ্রু ধারা সংবরণ করতে পারলেন না, প্রেমাশ্রু ক্ষরিত নেত্রে শ্রীমূর্তির চরণ মূলে পড়ে বন্দনা করলেন ও ঠাকুরকে কোলে উঠিয়ে কুটীরে নিলেন। অতঃপর একখানি পিড়ির উপরে বস্ত্র পেতে তাতে ঠাকুরকে বসালেন। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে শ্রীসনাতনের অঙ্গ রোমাঞ্চ হচ্ছে, কি সুকোমল স্পর্শ! সাক্ষাৎ মদন গোপাল। এবার শ্রীসনাতনের সেই গোপ বালকের কথা মনে হতে লাগল, তিনি মনে মনে ঠাকুরের এই চরিত্র চিন্তা করে বিস্ময় হতে

লাগলেন। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে সংবাদ পাঠালেন, সংবাদ শুনেই শ্রীরূপ গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামীগণ চারিদিক থেকে এসে হাজির হলেন। ঠাকুর দর্শন করে সকলে প্রেমাশ্রু ধারায় প্লাবিত হতে লাগলেন। তারপর ঠাকুরের স্নান অভিষেক ভোগ রাগের ব্যবস্থা হতে লাগল। পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ আনন্দভরে উপস্থিত হলেন এবং ঠাকুরের ভোগ রন্ধনাদি কার্য্য করতে লাগলেন। স্বয়ং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী অভিষেকাদি করলেন। তৎক্ষণাৎ একজন ভক্তকে পুরীধামে মহাপ্রভুর কাছে এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীমদনমোহন প্রকট হয়েছেন।

শ্রীসনাতনের কাছে এ ভাবে শ্রীমদনমোহন প্রকট হলেন।

শ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্মাণ
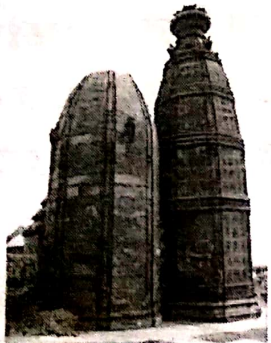
শ্রীসনাতন গোস্বামী আটা ভিক্ষা করে এনে রুটি করে মদনমোহনকে অর্পণ করতেন। তার সঙ্গে একটু শাক তরকারী অর্পণ করতেন। কোনদিন তৈল অভাবে তরকারী হয় না, শুষ্ক রুটিমাত্র ভোগ দেন। এতে শ্রীসনাতনের হৃদয়ে বড় কষ্ট হতে লাগল, কিন্তু উপায় নাই; কারণ মহাপ্রভু তাঁকে

যে সেবা দিয়েছেন, ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নাদি তা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন; কখন তিনি পয়সা ভিক্ষা করবেন? তাতে তৈল লবণ আনবেন? শ্রীসনাতন গোস্বামীর মনে কষ্ট হতে লাগল- মদনমোহন মহারাজ কুমার, তিনি শুষ্ক রুটি খান?

"মহারাজ কুমার মদনমোহন।
তিহ শুষ্ক রুটি ভুঞ্জে দুঃখী সনাতন ॥"

-(ভক্তি রত্নাকর ২/৪৬২)

অন্তর্যামী মদনমোহন সনাতনের মন জানলেন। আমি শুষ্ক রুটি খাই; সনাতনের মনে তাতে দুঃখ হচ্ছে, সনাতন রাজসেবা করতে চায়।

"সনাতন মন জানি মদন গোপাল।
নিজ সেবা বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল ॥"

--(ভঃ রঃ ২/৪৬৩)

শ্রীমদনমোহন নিজ সেবা সম্পদ বৃদ্ধি করবার ইচ্ছা করলেন। ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছাধীন। ভক্তের যে ইচ্ছা হয় তিনি তা পূর্ণ করেন। ভক্তের সুখ দান হেতু তাঁর এ অর্চাবতার।

শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাণিজ্য করবার জন্য মথুরায় এসেছিলেন। যমুনার চরে তাঁর নৌকা লেগে গেছে, কোন উপায়ে নৌকা জলে নামাতে পারে না, কি হবে? কৃষ্ণদাস কপূর লোক মুখে শুনতে পেলেন বৃন্দাবনে একজন

বড় সাধু বাস করেন, তাঁর নাম শ্রীসনাতন গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর তাঁর কাছে এসে দণ্ডবৎ করলেন ও বিনীত ভাবে বললেন বাবা! আমাকে একটু কৃপা করুন। সনাতন গোস্বামী বসে লিখছিলেন। তাঁর পরিধানে একটি কৌপীন, গাত্রে একটি ছিড়া কাঁথা। কৃষ্ণদাস কপূরের দিকে একটু হাস্য মুখে তাকিয়ে তাকে বসবার একটি পত্রাসন দান করলেন। কপূর সে আসনটি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে ভুমিতে বসলেন এবং বললেন বাবা! একটু কৃপা করুন?

শ্রীসনাতন - আমি ভিখারী কি কৃপা করব?

কৃষ্ণদাস কপূর - কেবলমাত্র আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। যমুনার চড়ায় আমার নৌকা লেগে তা সরছে না।

শ্রীসনাতন- আমি ত কিছুই জানি না, ঐ মদনমোহনকে বলুন। কৃষ্ণদাস দন্ডবৎ করে হে মদনমোহন! তোমার কৃপায় যদি চড়া থেকে নৌকা সরে যায়, তবে এবার যত লাভ হবে সব তোমার সেবার জন্য দেব। এরূপ প্রার্থনা করে কৃষ্ণদাস কপূর বিদায় হল। সেদিন বিকালে এমন ঝড় বৃষ্টি হল যে, কপূর শেঠের নৌকা অনায়াসে যমুনার মধ্যে চলে গেল। কৃষ্ণদাস সেইবার ব্যবসা করে, কপূরের বহু টাকা লাভ হলে তা দিয়ে মদনমোহনের জন্য সুন্দর মন্দির, রন্ধনশালা ও ভোগশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলেন। শ্রীমদনমোহনের সেই রাজসেবা দেখে সনাতন গোস্বামী খুবই সুখী হলেন।

সমস্ত গোস্বামীগণের অপ্রকটের পর বৃন্দাবনে দিল্লীর মোঘল সম্রাটগণ বড়ই অত্যাচার করতে লাগলেন-জয়পুরের রাজা (১৭০০-১৭৪৩ খৃঃ) দ্বিতীয় সওয়াই জয় সিংহ -তিনি বড় ভক্তিমান, তিনি এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মদনমোহনকে স্বীয় রাজ্যে নিয়ে যান। কিছুকাল পরে উক্ত সওয়াই জয় সিংহের শ্যালক করৌলীরাজ শ্রীগোপাল সিংহ (১৭২৪-১৭৫৭ খৃঃ) শ্রীমদনমোহনকে স্বীয় রাজধানী করৌলীতে নিয়ে আসেন। বর্তমানে ঠাকুর এখানেই আছেন।

জয় শ্রীমদনমোহন দেব কি জয়। জয় শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ কি জয়।
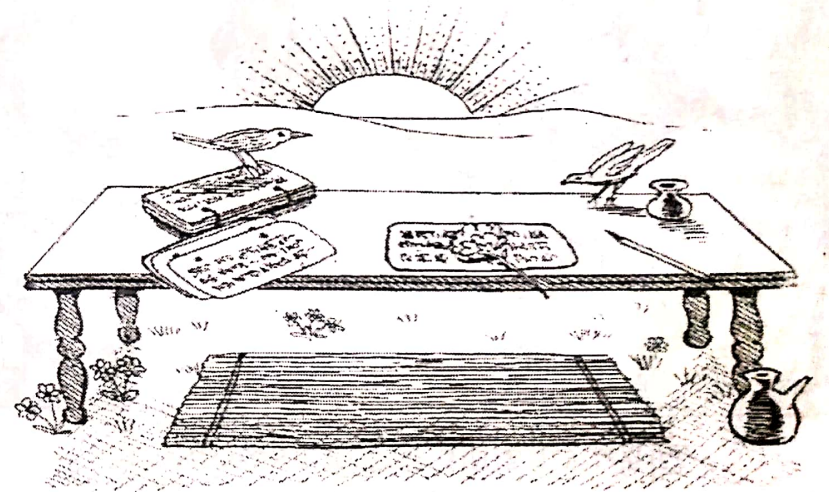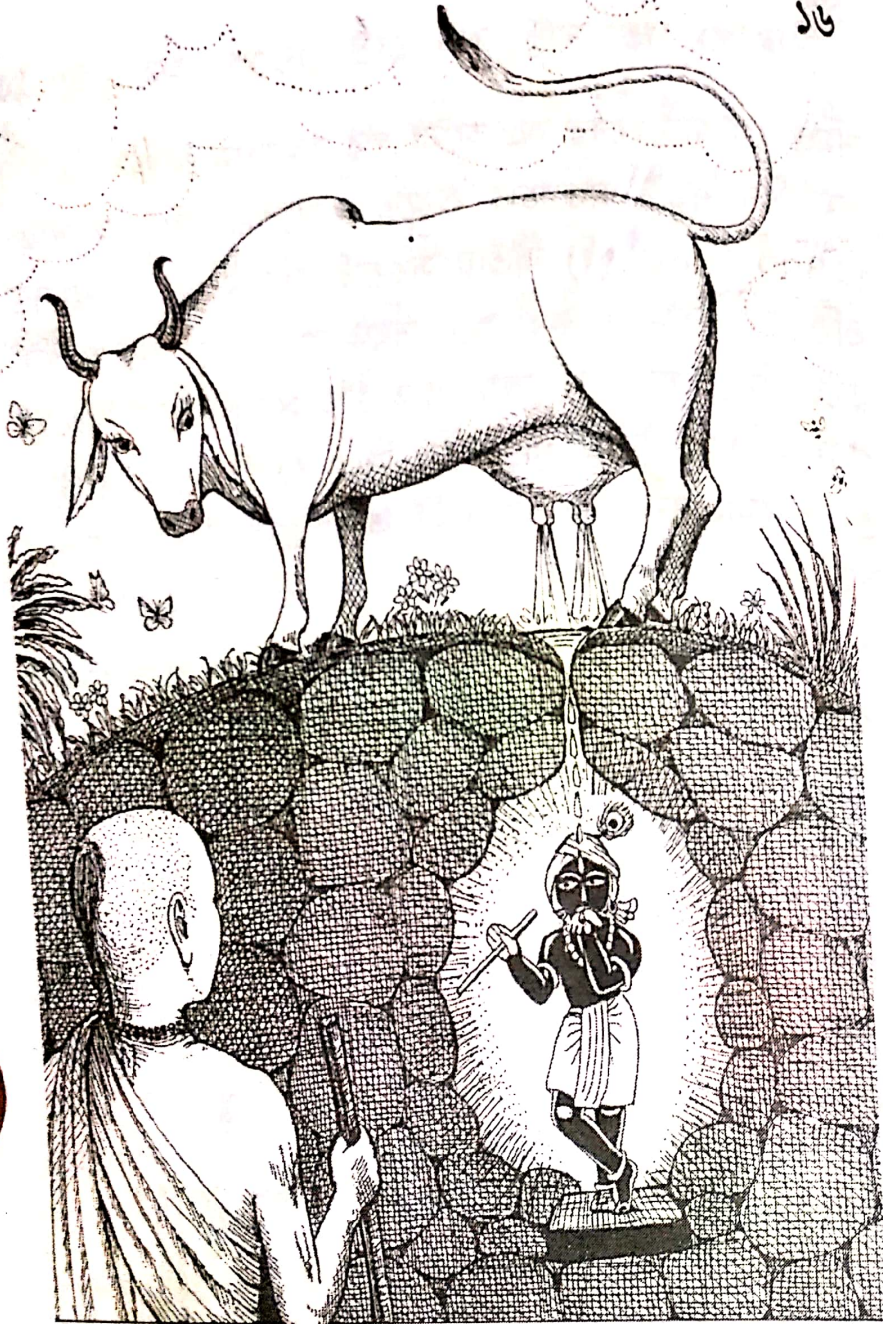
শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব

শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরীতে দোলযাত্রা দেখে মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। যে পথে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন তিনিও সেই পথ ধরে শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড়দেশস্থ পরিবারবর্গের যথাযথ ব্যবস্থা করে শ্রীবৃন্দাবন ধামে ফিরে এলেন।

দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবন ধামের অপূর্ব কদম্ব তমালাদি তরুর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন, অপ্রাকৃত ভূমির ধূলিকণায় গড়াগড়ি ও শ্রীরাধামাধবের মধুর লীলাবলী কীর্ত্তন করতে করতে তাঁরা পরিক্রমা করছেন। আজও শ্রীহরি নিত্য নিকুঞ্জ কাননে ব্রজবধু সঙ্গে মধুর মনোহর রাস বিলাস করছেন, আজও কুঞ্জকাননে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রস্ফুটিত কুসুম কুঞ্জে অলিকুল গুঞ্জিত পুষ্প তল্পে শয়ন লীলা করছেন।

সেই মধুর বৃন্দাবন ভূমিতে আজও কুঞ্জ কাননে শুকশারী

মনোহর আলাপ করছেন ও কোকিল কুলের পঞ্চম তানের সুর বৃন্দাবন ভূমিতে রসাল করে রেখেছে।

শ্রীরূপ সনাতন দুই ভাই সমাধিস্থ চিত্তে যেন অনুভব করছেন, অপ্রাকৃত মধুর যমুনার তটভূমিতে প্রস্ফুটিত পুষ্পশ্রেণী শোভিত বৃক্ষরাজির তলে মাধব মাধবীগণ সঙ্গে নৃত্য কলারঙ্গে বিহার করছেন, কিন্তু ইহা তাঁদের সাক্ষাৎ নয়নগোচর হচ্ছে না, তাই তাঁদের প্রাণে পূর্ণানন্দ হচ্ছে না।

শ্রীরূপ গোস্বামী একদিন যমুনার নির্ম্মল তটে বসে মনে মনে মহাপ্রভুর কথা ভাবছেন ও বলছেন- "প্রভুর আদেশ কিছুই পালন হল না, এ জীবনটাই ব্যর্থ? এরূপ বলতে বলতে নয়নাশ্রুতে ভাসছেন; ঠিক এমন সময় তথায় এক গোপ কুমার উপস্থিত হয়ে বললেন - স্বামী! অশ্রুপাত করছেন কেন? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোন গুরুতর চিন্তা পরায়ণ?

শ্রীরূপ গোস্বামী - হাঁ গোপকুমার! আমি কিছু চিন্তান্বিত।

গোপকুমার - স্বামী! কি চিন্তা করছেন! গোপকুমারটি বেশ সুন্দর চেহারাধারী কথাগুলি খুব মধুর।

শ্রীরূপ - তোমাকে বললে কি হবে?

গোপকুমার - হাঁ নিশ্চয় সফল হবে?

শ্রীরূপ - আমি মহাপ্রভুর নির্দেশে এখানে এসেছি।

গোপকুমার - তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন?

শ্রীরূপ - শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করতে হবে? তাই ভাবছি।

গোপকুমার - স্বামী! আমার সঙ্গে আসবেন?

শ্রীরূপ - তুমি কোথায় নিয়ে যাবে।

গোপকুমার - যেথায় নিয়ে যাই আপনি আসুন।

শ্রীরূপ - আচ্ছা চল।

গোপকুমারের এসব কথা শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী একটু মনে মনে বিস্ময়ান্বিত হচ্ছেন অকস্মাৎ গোপকুমার কোথা থেকে এল, একে ত দেখতে শুনতে ভাল লাগছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন মদনদেবের ন্যায় সুন্দর, কথাগুলি সুন্দর - মহাপুরুষের লক্ষণও প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীরূপ গোস্বামী গোপকুমারের সঙ্গে চলছেন। ক্রমে এলেন গোমাটিলার নিকট। গোপকুমার বললেন-স্বামী! এ টিলাটি দেখছেন? এ টিলার নাম **"গোমাটিলা"** এর মধ্যে শ্রীগোবিন্দ আছেন। প্রতিদিন একটি কামধেনু এসে এ টিলাটিকে দুগ্ধধারায় স্নান করিয়ে চলে যায়।

শ্রীরূপ গোস্বামী গোমাটিলাটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। এদিকে গোপকুমার অন্তর্ধ্যান হলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পিছনে ফিরে আর তাঁকে দেখতে পেলেন না, তিনি অবাক হলেন।

নিশ্চয় সেই গোবিন্দ গোপকুমার রূপে আমাকে দেখা দিয়ে চলে গেল; আমি অভাগা বুঝতে পারলাম না।

পরদিন শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বাহ্নে সেখানে এলেন এবং দেখলেন সত্যই একটি কামধেনু এসে সেই টিলাটিকে দুগ্ধধারায় স্নান করিয়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি এবার সবকথা বুঝতে পারলেন। গোস্বামীর আনন্দে হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠল। তিনি শীঘ্রই গ্রামে এলেন এবং ভব্য ভব্য গোপগণকে ডেকে এসব কথা বললেন। তাঁরা শুনে খুব সুখী হলেন ও তৎক্ষণাৎ কোদাল কুড়ালি নিয়ে গোমাটিলায় এলেন এবং গোস্বামীর নির্দ্দেশে খনন আরম্ভ করলেন। অল্প খনন করতেই অপূর্ব গোবিন্দ মূর্তি দর্শন হল, মূর্তিখানি কোটি কন্দর্পের রূপের দর্পহারী নয়ন মনের আনন্দ বর্দ্ধনকারী। আনন্দ ভরে গোপগণ মহা হরি হরি ধ্বনি করে উঠলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমাশ্রু পুরিত নয়নে সাষ্টাঙ্গ দন্ডবৎ করলেন।

"শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্যা লোক ধায় চারিভিতে॥"
(ভক্তি রত্নাকর ২/৪৩৩)

ব্রজবাসিগণ আনন্দভরে ভারে ভারে দই, দুধ, চাউল তরি-তরকারী ও বিবিধ প্রকার অন্যান্য সামগ্রী আনতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর ছোট একটি পত্রের গৃহ নির্মাণ করে সেখানে

শ্রীগোবিন্দ দেবের স্থাপন হল। শ্রীরূপ গোস্বামী এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ অন্যান্য গোস্বামীগণের নিকট প্রেরণ করলেন। গোস্বামীগণ এ আনন্দ সংবাদ শ্রবণে শ্রাবণের মেঘ দর্শনে ময়ূরগণ যেমন নৃত্য কলা বিস্তার করে তদ্রুপ তাঁরা আনন্দ ভরে নাচতে নাচতে তথায় এলেন, অপূর্ব শ্রীগোবিন্দ মুর্তি দর্শন করলেন। প্রেমানন্দে সাষ্টাঙ্গে দন্ডবৎ বন্দনা স্তুতি অন্তে শীঘ্র শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী অভিষেক কার্য্য আরম্ভ করলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের মহামহাভিষেকের সময় ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য গীত করতে লাগলেন। মহাভিষেকের পর ভোগরাগ হল। অতঃপর দন্ডবৎ প্রণামাদি ও পরিক্রমান্তে গোস্বামীগণ আগত ব্রজবাসী-ব্রজবাসিনী অতিথি ব্রাহ্মণাদিগণকে মহাপ্রসাদ দানে পরিপূর্ণ তৃপ্তি করান। সকলে মহানন্দে প্রসাদ সেবা করেন। শীঘ্রই একজন ভক্তকে পত্র লিখে পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পাঠালেন।

শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাব হল। মহাপ্রভু এ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দ সাগরে মগ্ন হলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে পাঠালেন। তিনি গোবিন্দদেবের সেবায় দেখাশুনা করতে লাগলেন। শ্রীরূপগোস্বামীর কোন ধনাঢ্য শিষ্য শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দির নির্মাণ করে দেন।

অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাভার গ্রহণ করেন। পরে শিবরাম গোস্বামী সেবাভার গ্রহণ করেন। ১৭০৭ খৃঃ গোবিন্দদেব মুসলমানগণের অত্যাচারে জয়পুরে রাজবাড়ীতে শুভ বিজয় করেন।

শ্রীশ্রী গোবিন্দদেব

শ্রীশ্রী টোটা শ্রীগোপীনাথ

শ্রী গদাধর পণ্ডিতের টোটা শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পবর্ত থেকে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ উত্তোলন করে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সেবাভার অর্পণ করলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিত্য সেবিত বিগ্রহ সাক্ষাৎ গোপীনাথ। শ্রীগদাধর পণ্ডিত স্বহস্তে রন্ধন করে বহু আদরে গোপীনাথকে ভোজন করাতেন। শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে গৌরসুন্দর বিলীন হয়ে নিত্যলীলা করেছেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হলে উচ্চ বিগ্রহের কণ্ঠে ফুলের মালা দিতে খুব কষ্টবোধ করতেন, তাই একদিন পণ্ডিত গোস্বামী বললেন-গোপীনাথ! তুমি একটু বসলে মালা পরাতে সুবিধা হত। পণ্ডিত গোস্বামীর বাক্যে গোপীনাথ যোগাসনে উপবেশন করলেন। আজও তিনি উপবেশন করে আছেন।

গোপীনাথ ভক্তাধীন। ভক্ত যা বলেন তিনি তা পালন করেন। আজও উপবেশন পূর্বক মুরলী অধরে ধরে ব্রজদেবীগণের চিত্ত আকর্ষণ করছেন। তিনি বংশীবটের তলস্থিত হয়ে গোপীগণের প্রাণ আকর্ষণ করেন। এভাবে আকর্ষণে তাঁদের চিত্ত মনাদিকে রমণ করেন বলে গোপীরমণ বা গোপীনাথ নাম ধারণ করেছেন। তিনি নিত্য রাসবিলাসী রসিকশেখর। তিনি পুরীধামে **টোটা গোপীনাথ** নামে প্রসিদ্ধ।
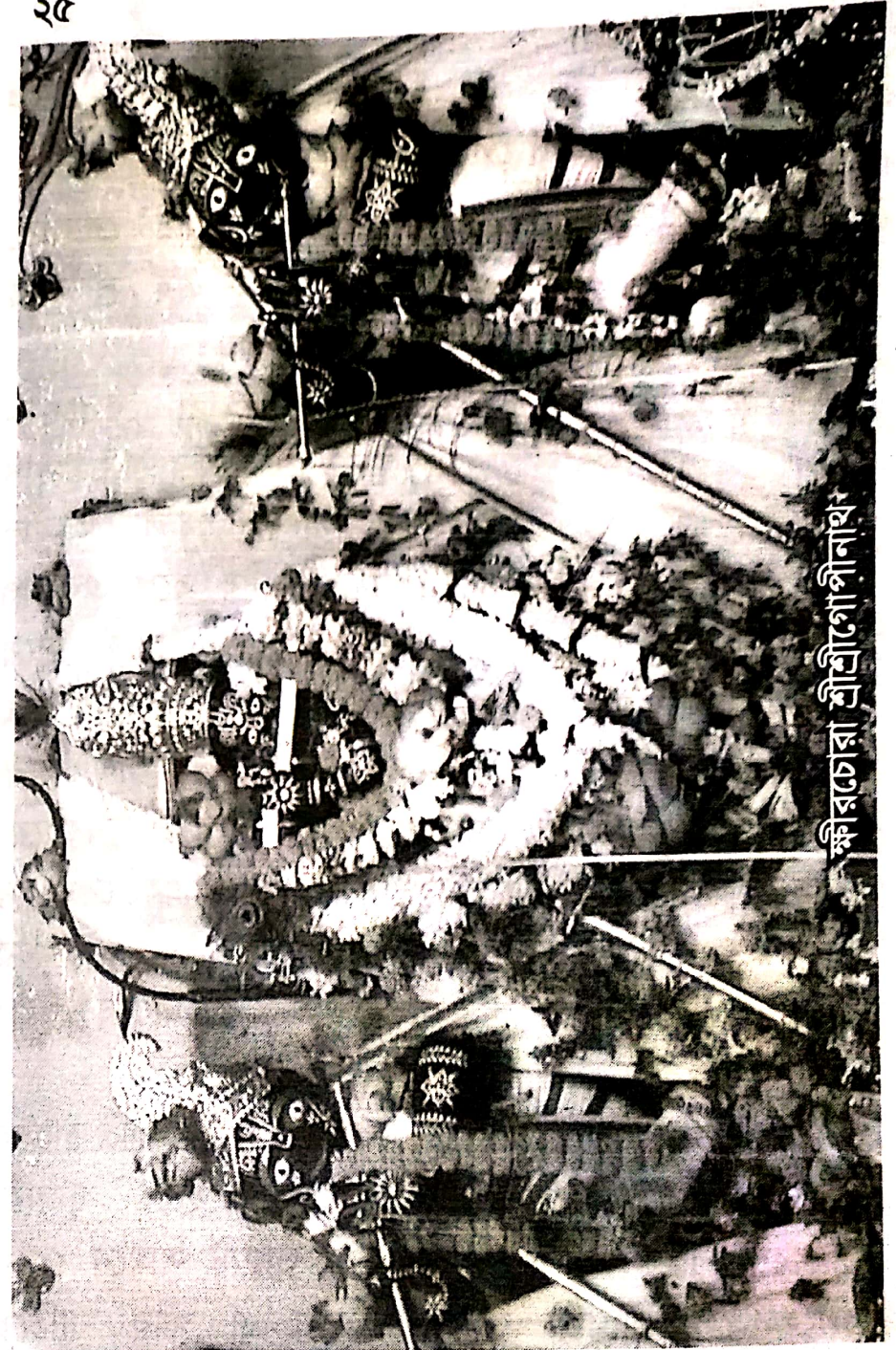
ক্ষীরচোরা শ্রীশ্রীগোপীনাথ

ক্ষীরচোরা শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ
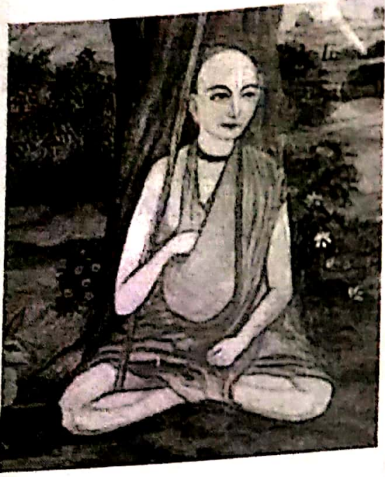
উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায়, রেমুণা গ্রামে এই শ্রীবিগ্রহ অবস্থান করছেন।

পূজারীকে স্বপ্নে বলছেন- পূজারী! শীঘ্র কর গাত্রোত্থান এবং মন্দির খোল; আমার গাত্রের উড়ুনীর তলে একভাণ্ড ক্ষীর আছে, এটিকে নিয়ে রেমুণার হাটেতে 'মাধবপুরী' নামে এক সাধু আমার নাম করছে, তাঁকে দাও। পূজারীর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তিনি চমকে উঠে বললেন-আমি কি দেখলাম? তৎক্ষণাৎ হাত মুখ ধুয়ে, ধোয়া কাপড় পরে, শ্রীমন্দিরের কপাট খুললেন এবং দেখলেন উড়ুনীর তলে এক ভান্ড ক্ষীর আছে। সেই রাত্রে, সেই ক্ষীর নিয়ে ব্রাহ্মণ রেমুণার বাজারে এলেন এবং মাধবেন্দ্রপুরী! মাধব পুরী! বলে ডাকতে লাগলেন-

পূজারী মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শন পেলেন। পুরী একটি চালের তলে বসে সানন্দে শ্রীহরিনাম করছেন। পূজারী মাধবেন্দ্রপুরীকে নমস্কার করে ক্ষীর ভান্ডটি সামনে রেখে বললেন-গোপীনাথজী আপনার জন্য এ ক্ষীর পাঠিয়ে

দিয়েছেন। আপনি গ্রহণ করুন। মাধবেন্দ্রপুরী অবাক! এতরাত্রে গোপীনাথ তাঁর জন্য ক্ষীর পাঠিয়েছেন আশ্চর্য্যজনক কথা। তারপর তিনি ভাবলেন ঠাকুর অন্তর্যামী, আমি ক্ষীর স্বাদ নিয়ে সেই প্রকারের ক্ষীর করে গোপালকে দিব জানতে পেরে এ ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অতঃপর পূজারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি সমস্ত কথা বললেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই ক্ষীর ভোজন করে, সেই রাত্রেই তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। গোপীনাথ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন বলে **"ক্ষীরচোরা গোপীনাথ"** তাঁর নাম হয়েছে।

শ্রীসারঙ্গ মুরারীর শ্রীগোপীনাথ

শ্রীসারঙ্গ মুরারীর শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ

বর্দ্ধমান জেলায় মামগাছি গ্রামে, এই ঠাকুর অবস্থান করছেন। মহাপ্রভু নিত্য সারঙ্গ ঠাকুরের গৃহে আগমন করতেন এবং গোপীনাথকে স্তুতি বন্দনাদি করতেন। গোপীনাথ শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের প্রাণ। তিনি অতি স্নেহ ভরে গোপীনাথকে সেবা করতেন। গোপীনাথের সেবার পরিপাটি দেখে মহাপ্রভু বড়ই সুখী হতেন এবং বলতেন- সারঙ্গ! তোমার পুত্রও নাই, শিষ্যও নাই, তোমার পর গোপীনাথের সেবা কে করবে? মহাপ্রভু প্রায় দিন সারঙ্গকে এই কথা বলতেন। একদিন শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বললেন-তুমি যখন প্রতিদিন একই কথা বলছ; তাই কাল প্রাতেঃ সর্বপ্রথমে যাকে দেখব তাকে শিষ্য করে গোপীনাথের সেবায় অর্পণ করব।

সারঙ্গ ঠাকুর প্রতিদিন খুব ভোরে ভোরে গঙ্গাস্নান করতেন। একদিন ঐরূপ ভোর ভোর গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছেন, ঘাটে পা দিতেই একটি মৃতদেহের অঙ্গে পা লাগল। তিনি সেই শবটিকে টেনে ঘাটের উপর তুললেন এবং বললেন-হরিবোল!

হরিবোল! ভক্তের কি অচিন্ত্য শক্তি? মৃতদেহটি হরিবোল! হরিবোল? বলতে বলতে উঠে বসলেন। সারঙ্গ ঠাকুর বললেন -তোমার নাম কি? মৃতদেহটি বললেন-আমার নাম মুরারী।

সারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে সঙ্গে করে গৃহে এলেন এবং কিছুদিন পর তাঁকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করলেন ও তার প্রতি গোপীনাথের সেবা ভার অর্পণ করলেন।

মহাপ্রভু এসব দেখে সারঙ্গ ঠাকুরের উপর বড়ই প্রীত হলেন।

মৃত মুরারিকে প্রাণ দান দিয়েছিলেন বলে সারঙ্গ-মুরারি এই নাম তিনি প্রাপ্ত হন।
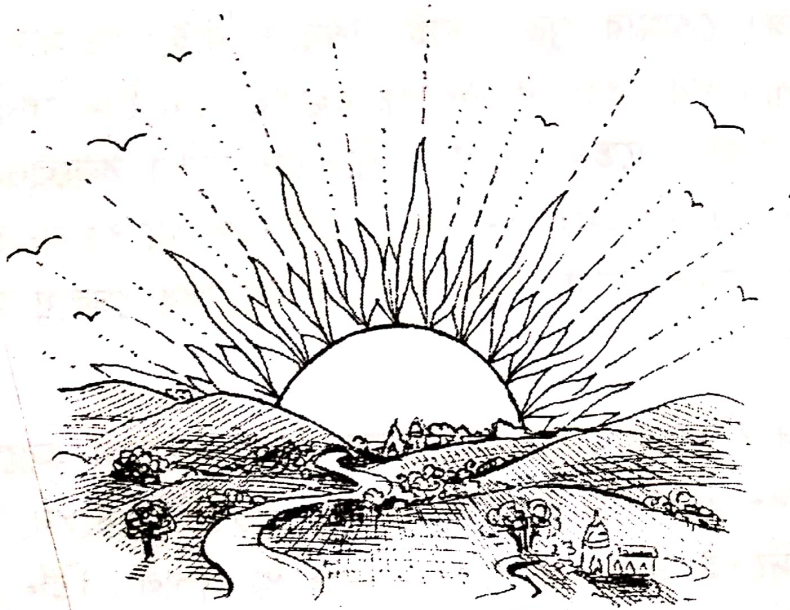
শ্রীশ্রী গোপীনাথ

শ্রী গোবিন্দ ঘোষের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ

নদীয়া জেলায় অগ্রদ্বীপ নামক স্থানে এই ঠাকুর অবস্থান করছেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের কোন পুত্রাদি ছিলেন না। বৃদ্ধকালে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর একদিন চিন্তা করছেন-কোন পুত্র সন্তান ত' নাই, মৃত্যুর পর আমার পিণ্ড কে দিবে?

সে দিবসের রজনী শেষে স্বপ্নে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরকে বলছেন-আমিই ত তোমার পুত্র সন্তান। আমিই শ্রাদ্ধ করব।

ভগবান ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব। তিনিই পুত্র, তিনিই স্বজন ও মাতা পিতা প্রভৃতি। গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের প্রতি বড়ই প্রীত। গোবিন্দ ঘোষও সেই গোপীনাথ ছাড়া কিছুই জানতেন না।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর কিছুদিন পরে অপ্রকট হলেন। শ্রীগোপীনাথ জীউ পূজারীকে স্বপ্নে বললেন-আমি গোবিন্দ ঘোষের পুত্র, আমি তাঁর শ্রাদ্ধ করব। পরদিন গোপীনাথ পিতৃশোক চিহ্ন কণ্ঠে ধারণ করলেন; এবং শ্রাদ্ধ করলেন।

ভগবানের মহিমা অচিন্ত্য। আজও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে গোপীনাথ শোক চিহ্ন ধারণ করেন এবং শ্রাদ্ধ করে থাকেন।

জয় ভক্ত বৎসল শ্রীগোপীনাথ জীউ কি জয়।

শ্রীশ্রীরাধারমণ

শ্রীগোপাল ভট্টের শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ

শ্রীভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটি শালগ্রামের সেবা করতেন। বৃন্দাবন ধামে তাঁর খুব খ্যাতি। বিভিন্ন স্থান হতে বড় বড় ধনী ও পণ্ডিত বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে আসতেন এবং প্রায় সকলেই শ্রীভট্ট গোস্বামীকে একবার দর্শন করতেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী যেমন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি বিনয়ী, সদ্ গুণাবলীতে পূর্ণ ছিলেন।

একদিন এক ধনী শ্রীভট্ট গোস্বামীর দর্শনে এলেন। ধনীটি পরম ভক্ত। তিনি শ্রীভট্ট গোস্বামীকে বন্দনাদি করে তাঁর ঠাকুরের জন্য সুবর্ণের বহু অলঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি অর্পণ করলেন। বললেন-গোস্বামী জী! আপনার ঠাকুরকে এসব পরিয়ে দিবেন।

ধনীটিকে শ্রীভট্ট গোস্বামী কিছুক্ষণ ভগবদ্ তত্ত্ব উপদেশ করলেন। অতঃপর ভট্ট গোস্বামীকে বন্দনা পূর্বক ধনীটি

বিদায় নিলেন।

রাত্রিকালে শয়ন করে শ্রীভট্ট গোস্বামী চিন্তা করতে লাগলেন- শ্রীবিগ্রহ হলে, এসব বস্ত্রালঙ্কার তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিভূষিত করা যেত।

ভগবান্ ভক্তপ্রিয়। ভক্ত যা যা ভাবনা করেন, তিনি সব পূর্ণ করে থাকেন। ভক্তের ইচ্ছানুরূপ তিনি শ্রীমূর্তি ধারণ করেন। তাঁর অবতারও ভক্তের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটি শালগ্রাম ছোট একটি পর্ণ কুটীরে রাখতেন, বিগ্রহগণকে একটি ঝুড়ীতে চাপা দিয়ে রাখতেন। সেটিকে বস্ত্রাবৃত করে রাখতেন যাতে কীটাদি প্রবেশ করতে না পারে।

শ্রীভট্ট গোস্বামী প্রাতঃ যমুনা স্নানাদি করে নিত্য ক্রিয়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলকাদি ধারণ করেঃ পর্ণ কুটীর খুলে ঠাকুর জাগরণ করছেন। ঝুড়ীটি তুলে দেখলেন আশ্চর্য্য ঘটনা। দ্বাদশটি শালগ্রামের মধ্যে যে শালগ্রামটি মধ্যে ছিলেন তিনি অপূর্ব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা গোপালদেব রূপে শোভা পাচ্ছেন। কেবল তাঁর পৃষ্ঠদেশে সেই শালগ্রামের চিহ্নটি আছে।

শ্রীভট্ট গোস্বামীর মনে আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুরটিকে বক্ষে তুলে নিলেন এবং প্রেমাশ্রু নেত্রে তাঁর শ্রীঅঙ্গে সেই বস্ত্র

আভরণ দিয়ে সাজিয়ে দিলেন-নাম হল 'শ্রীরাধারমণ'। এ শুভ সংবাদ ভট্ট গোস্বামী তৎক্ষণাৎ অন্যান্য গোস্বামীপাদগণের নিকট প্রেরণ করলেন। গোস্বামীগণ শ্রবণে আনন্দে বিভোর, সকলেই তদ্দর্শনে আগমন করলেন ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন রোলে শ্রীভট্টের কুটীর প্রাঙ্গণ মুখরিত করতে লাগলেন।

আজও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর প্রকট মহা মহোৎসব শ্রীবৃন্দাবন ধামে অনুষ্ঠিত হয়। এখনোও আড়াইমণ দুগ্ধের দ্বারা ঐ তিথিতে মহা অভিষেক হয়।

"গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়
শ্রীরাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়"

প্রেম সে বল শ্রীগোপাল ভট্টের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ কি জয়!
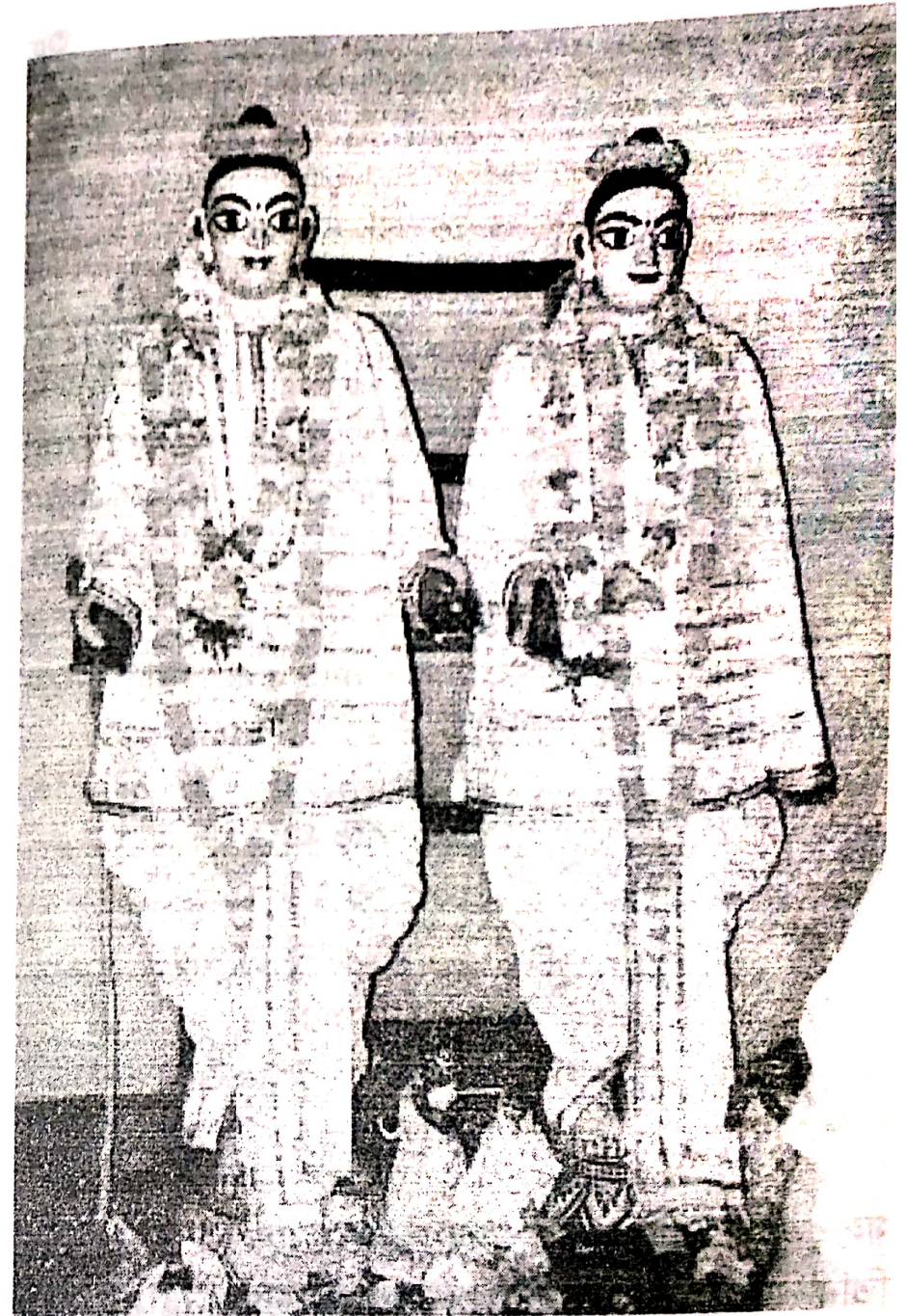
শ্রীশ্রী গৌর নিতাই

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীগৌর নিতাই

শ্রীগৌরীদাসের সমাধী মন্দির

বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনা, শহর শান্তিপুরের অপর পারে। এ স্থানে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ভজন করতেন। তিনি শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রিয়তম পাত্র ছিলেন। প্রায় সময়ে সময়ে এসে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ তাঁর গৃহে সংকীর্ত্তন বিলাস করতেন।

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট চাইলেন, তখন তিনি কেঁদে প্রভুর শ্রীচরণ ধরে বলেছিলেন-

“কাঁন্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদ তলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥ ”

মহাপ্রভু শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের এইরূপ মিনতি শ্রবণ করে তিনি স্বয়ং দুইটি মুর্তি নির্মাণ করালেন এবং সেই দুই মুর্তি

দিয়ে বললেন-“এই মুর্তি সেবা কর, ইহাতে আমরা আছি। গৌরীদাস পণ্ডিত সে কথায় সুখী হচ্ছেন না দেখে, প্রভু বললেন-গৌরীদাস! আমরা আজ তোমার ঘরে ভোজন করব। আমাদের দুইজনের ও এই দুই মুর্তির চারটি ভোগ তৈরী কর। মহাপ্রভুর নির্দেশ মত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত চারিখানা ভোগ লাগালেন এবং চারখানা আসন বসতে দিলেন। শ্রীগৌরনিতাই ও দুই মূর্তি, স্বয়ং আসনে উপবেশন করলেন এবং একসঙ্গে ভোজন করতে লাগলেন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন-

“নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম এই দুই ভাই ॥”

গৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমাশ্রু ক্ষরণ নেত্রে বললেন হে প্রভু! তুমি পতিত পাবন। তোমার যে ইচ্ছা সতত তাই পূর্ণ হউক। গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ নিত্য বন্দী হয়ে আছেন, তাই আজও স্বয়ং তার গৃহে বিরাজ করছেন।

প্রতিদিন পণ্ডিত স্বহস্তে অনেক ব্যঞ্জন রন্ধন করে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের ভোগ দিতেন। অতি বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হলেও, বহু ব্যঞ্জন রন্ধনে ক্লেশ হলেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করে নাই। ভক্তের কষ্ট ভগবান সহন করতে পারেন না। তাঁরা নিষেধ করেন-তুমি একটি শাক ব্যঞ্জন করে দিলে হবে। তিনি সে

কথা না শুনে তথাপি অনেক ব্যঞ্জন কষ্ট করে রন্ধন করতে লাগলেন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ একদিন নিরাহারে রইলেন। তখন গৌরীদাস পণ্ডিত অনুনয় করে বললেন-তোমাদের ভোজন না করাতে পারলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ তোমরা ভোজন কর, ভবিষ্যতে কেবল শাক অন্ন দিব। এই ভাবে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত কত প্রণয় ভঙ্গীতে তাঁদের ভোজন করাইতেন।

ভক্তের হাতে ভগবান খান। ভক্তের সুখে ভগবান সুখী হন।

শ্রীশ্রী রসিক রায়

শ্রীগঙ্গামাতার শ্রীশ্রীরসিকরায় বিগ্রহ

রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্মা নামক এক ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর গৃহে রসিকরায় নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠিকমত শ্রীবিগ্রহের সেবা করতে পারতেন না। একরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে জানালেন-তোমার ঘরে যে রসিকরায় শ্রীবিগ্রহ আছে, তাঁর ভালভাবে সেবা হচ্ছে না। তুমি শীঘ্র তাঁকে শ্রীক্ষেত্রে শ্বেত গঙ্গার তটস্থিত গঙ্গামাতার নিকটে পৌঁছিয়ে দাও। নতুবা তোমার অকল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণ ভগবানের আদেশ পেয়ে বিলম্ব করলেন না। শীঘ্র রসিকরায়কে নিয়ে শ্রীক্ষেত্র ধামে এলেন এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগঙ্গা মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। শ্রীরসিকরায়কে দর্শন করে শ্রীগঙ্গামাতা খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বললেন। তা শুনে শ্রীগঙ্গামাতা বললেন-আমি ভিখারিণী, মাধুকরী করে খাই। বিগ্রহ সেবা কি করে করব? আপনি বিগ্রহ নিয়ে যান। আমাকে অপরাধী করবেন না। ব্রাহ্মণ নিরুপায়, কি করবে? খুব ভেবে চিন্তে, অবশেষে শ্রীগঙ্গা মাতার তুলসী কাননের মধ্যে শ্রীরসিকরায়কে রেখে ব্রাহ্মণ রাত্রে পালিয়ে গেলেন।

গঙ্গা মাতা গোস্বামীনীর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়া নামক স্থানে, তাঁর পিতা বিরাট জমিদার রাজা উপাধি ভূষিত শ্রীযুক্ত নরেশ নারায়ণ। তাঁর একমাত্র কন্যা গঙ্গামাতা। তাঁর শিশুকালের নাম ছিল শচী । তিনি বিবাহ করেন নাই। পিতা-মাতার অন্তর্ধ্যানের পর তিনি বৃন্দাবন ধামে গমন করেন এবং শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট থেকে চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনে "রাধাকৃষ্ণ" মন্ত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য-তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত।

শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের নির্দেশ মত গঙ্গামাতা পুরীধামে এসে ভজন করেন। তিনি ঠিক রঘুনাথ গোস্বামীর ন্যায় অতিশয় নিস্কিঞ্চন ভাবে অবস্থান করতেন। তিনি তখনও পিতৃ সম্পদ পয়সা কড়ি গ্রহণ করেন নাই। পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দ দেব গঙ্গামাতা গোস্বামীর নিকট থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করেন।

যে দিবস রাজস্থানের ব্রাহ্মণটি রসিকরায়কে তুলসী কাননে রেখে পালিয়ে যায়, ঐ দিবসের রাত্রে শ্রীরসিকরায় স্বপ্নে শ্রীগঙ্গামাতাকে বলতে লাগলেন - আমি তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য এখানে এসেছি। ব্রাহ্মণ আমাকে তোমার তুলসী কাননে রেখে চলে গেছে। আমি সারাদিন স্নান ভোজনাদি কিছুই করি নাই। আমাকে ভোজন করাও।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর শ্রীহরি ভক্তের কাছে কি অপূর্ব, অচিন্ত্য লীলা বিলাস করেন, তা কার জানবার শক্তি আছে? তিনি নিত্যকাল ভক্তের সঙ্গে বিলাস করছেন।

স্বপ্ন দেখে শ্রীগঙ্গামাতা চমৎকৃত হলেন। স্বয়ং শ্রীহরি তার কাছে এসে কিছু ভোজন করতে চান। এসব চিন্তা করে গোস্বামিনী প্রেমে পুলকিত হয়ে, তাড়াতাড়ি স্নান করে ধৌত বস্ত্রাদি পরিধান করলেন এবং শীঘ্র তুলসী কাননে এলেন। একটি প্রদীপলোকে দেখলেন সেই রসিক রায় তুলসী মূলে বিরাজ করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে বন্দনা করে বিগ্রহকে কোলে তুলে নিলেন। ঠাকুরের সারাদিন স্নান ভোজন হয় নি, তবে গঙ্গামাতা বড় ব্যাকুল চিত্তে ঘরে নিয়ে এলেন। একটু জল গরম করলেন। ঠাকুরের অঙ্গে তৈল মর্দন করলেন। তারপর সেই উষ্ণ জলে নন্দ রাজকুমার রসিক রায়কে স্নান করালেন। গাত্র মার্জ্জনাদি করে বস্ত্রাদি পরালেন, চন্দন তিলকাদি করিয়ে ঠাকুরকে শরবৎ দিয়ে রন্ধান করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি একটি শাক ব্যঞ্জন ও অন্ন রন্ধন করে ভোগ লাগালেন। গঙ্গামাতা দেখলেন ক্ষুধার্ত শ্রীরসিক রায় সমস্ত উপকরণ দ্রুত ভোজন করছেন। তা দেখে শ্রীগঙ্গামাতা আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন এবং নতুন বস্ত্র দিয়ে রসিক রায়কে শয়ন করালেন। আমি অতি দীন পাপিনী! ঠাকুর

তথাপি তুমি নিজ কৃপায় আমার কাছে এলে? গঙ্গামাতা এই কথা বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং তিনিও শয়ন করলেন।

শ্রীগঙ্গামাতা বহু ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে প্রতিদিন রসিক রায়কে ভোজন করাতেন।

ভগবান্ বলেছেন ভক্ত আমার মাতা পিতা। ভক্তই আমার ইষ্ট বান্ধব। আমি ভক্তের দেহে সর্বদায় বিহার করি।

অদ্যাপি এই ঠাকুর পুরী ধামে শ্রীসার্বভৌম গৃহে শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামীনীর মঠে বিরাজ করছেন।

উড়িষ্যার শ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা
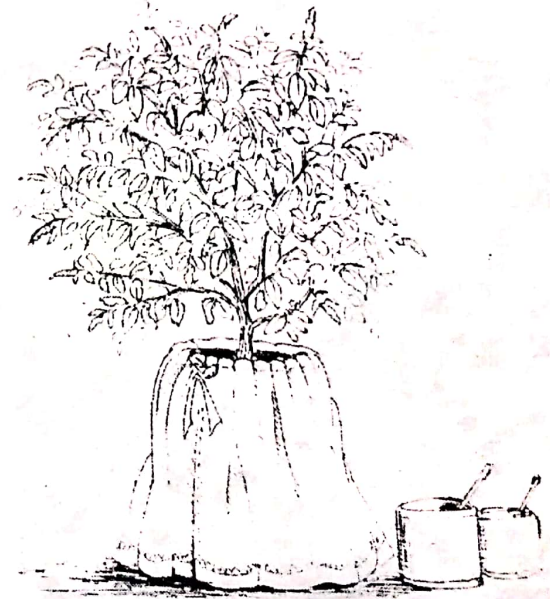
উরিষ্যার শ্রী জগন্নাথ বিগ্রহ

অশ্বমেধ যজ্ঞগুলি প্রত্যক্ষ করার জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সকল দেবগণকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। বহু ঋষি, মুনি ও বৈষ্ণবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক সুবিশাল সভাগৃহে যজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং ঐ গৃহের দীর্ঘ ছাদ তিন মাইল পরিমাণ বিস্তৃত ছিল। ঐ গৃহের তলদেশ বা মেঝে মূল্যবান মণিরত্ন দ্বারা দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তার চারপাশ সোনা ও রূপা দিয়ে বাঁধানো ছিল।

তারপর রাজা সমবেত সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্রের পূজা করলেন এবং বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করলেন। রাজা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করলেন, "হে দেবেশ্বর! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার সঙ্কল্প করেছি। আমি আবেদন রাখছি যে আপনি এবং অন্যান্য সকল দেবগণ যেন যজ্ঞ সমাপন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। আপনি শ্রীনীলমাধবের অনুগ্রহপূর্ণ দর্শন লাভ

করেছেন, কিন্তু এখন সেই শ্রীবিগ্রহ স্বর্ণবালুকার নীচে সমাবৃত। তিনি যদি পুনরায় আবির্ভূত হন, তাহলে আপনিও উপকৃত হবেন।"

রাজার অনুরোধ শ্রবণ করে ইন্দ্রদেব উত্তর দিলেন, "হে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, আপনি একজন মহাত্মা। আমি আপনার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা ইতিমধ্যেই অবগত আছি। এই শুভ যজ্ঞ ত্রিভুবনকে পবিত্র করবে। আমি অবশ্যই আপনার এই শুভকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করব। এখন আপনার এই ভগবদারাধনা-কর্ম আরম্ভ করুন।"

ইন্দ্রদেবের আশীর্বাদ গ্রহণ করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহান ঋষিবর্গের তত্ত্বাবধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কোনরকম দোষ-ত্রুটি ভ্রান্তি ছাড়াই সব কিছু খুব সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পাদিত হতে লাগল। এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করার পর, রাজা তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে নিবদ্ধ করলেন এবং ধ্যানে নিবদ্ধ করলেন এবং ধ্যানে তিনি শ্বেতদ্বীপ দর্শন করলেন। এই দ্বীপ ছিল স্ফটিকে নির্মিত এবং এর চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে ছিল দুগ্ধসাগর। নানা প্রভাময় মণিরত্নবিজড়িত প্রশস্ত পাদপীঠের উপরে একটি স্বর্ণ সিংহাসন ছিল, যার উপর চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু উপবিষ্টরূপে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর দক্ষিণভাগে ধরণীধর অনন্তশেষ ভগবানের

শ্রীমস্তকের উপর চক্রের ন্যায় ফণা বিস্তার করে বিরাজিত ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গকান্তি ছিল মেঘের মতো নীলাভ এবং তাঁর গলদেশে ছিল একটি সুদীর্ঘ পুষ্পমালা। ভগবানের বামভাগে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করছিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত ইতিবৃত্ত নারদ মুনিকে জানালেন। নারদ মুনি বললেন ভগবান যে নিজেকে প্রকটিত করবেন এটি তারই নির্দেশক লক্ষণ। তিনি আরও বললেন, "শ্রীবিষ্ণুর শ্রীদেহের রোম এই ধরণীতে পতিত হয়েছে এবং একটি বৃক্ষরূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি দারুরূপে, ব্রহ্মপুর বৃক্ষরূপে প্রকটিত হয়েছেন।" নারদ মুনি রাজাকে সেই বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেলেন। ভক্তিমান রাজা প্রণামপূর্বক বৃক্ষের পূজা করলেন। নারদ মুনি তখন প্রকাশ করলেন যে ঐ দিব্য দারু ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং, এবং দারু থেকে ভগবানের শ্রীমূর্তি নির্মাণ করতে হবে? কে নির্মাণ করবেন?" নারদ স্মিত হাস্য করে উত্তর দিলেন, "ভগবানের লীলা অপ্রাকৃত। তিনি কিভাবে প্রকটিত হবেন কে বলতে পারে!"

যখন তাঁরা এইরকম বাক্যালাপ করছিলেন, অদৃশ এক দৈববাণীতে এই বার্তা ধ্বনিত হল ঃ "শ্রীবিষ্ণুর অবতরণের রহস্য সংগুপ্ত রাখা হবে। এই দারুখণ্ড পনের দিন আবৃত রেখে দিন। এর থেকে শ্রীমূর্তিসমুহ খোদাই করার জন্য এক

প্রবীণ সুত্রধর এখানে আসবেন। এসময় পনের দিন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ রাখুন এবং দ্বারের সামনে নিরন্তর মৃদঙ্গ-ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাদনের ব্যবস্থা করুন। এইটি নিশ্চিত করবেন যে কেউ যেন খোদাইয়ের শব্দ শুনতে না পায়। কেউ যদি সেই শব্দ শোনে, তবে নিশ্চয়ই সে বধির হয়ে যাবে। এই সময় কেউই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করার প্রয়াস করবে না, করলে সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যাবে।"

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্পূর্ণ যথাযথরূপে ঐ নির্দেশগুলি পালন করলেন। পনের দিন পর ভগবান শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাদেবী এবং সুদর্শন চক্রের মূর্তিসমূহ প্রকটিত হল। পুনরায় এক অদৃশ্য কণ্ঠে নেপথ্যবাণী ঘোষিত হল ঃ " হে রাজন, এই চতুর্মূর্তি একটি বস্ত্রে আবৃত করুন এবং প্রাকৃতিক রঞ্জক দ্বারা বিগ্রহসমূহ রঙ করুন। প্রতি বছর পূর্বের রঙ স্নান হলে পুনরায় শ্রীমূর্তিসমূহ রঙ করবেন। বস্ত্রাদিশূন্য উন্মুক্ত দারুমূর্তি কেউ যেন দর্শন না করে।

হে রাজা, করুণাময় প্রভু আপনাকে ও তাঁর দর্শনকারী সকল জীবকে তাঁর কৃপাশিস প্রদানের জন্য এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন আপনি অবশ্যই ৬৬৬ হাত (এক হাজার ফুট) পরিমিত উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করবেন এবং এই মূর্তিসমূহ সেখানে স্থাপন করবেন।" রাজা

ইন্দ্রদ্যুম্ন পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে সেই আদেশ অনুসারে তাঁর সকল কর্তব্য সুসম্পন্ন করলেন। হাজার বছর পরও সেই শ্রীমন্দির সকল মন্দিরের শিরোমণিস্বরূপ হয়ে বিরাজ করছে, উৎকলদেশকে শোভিত করছে।
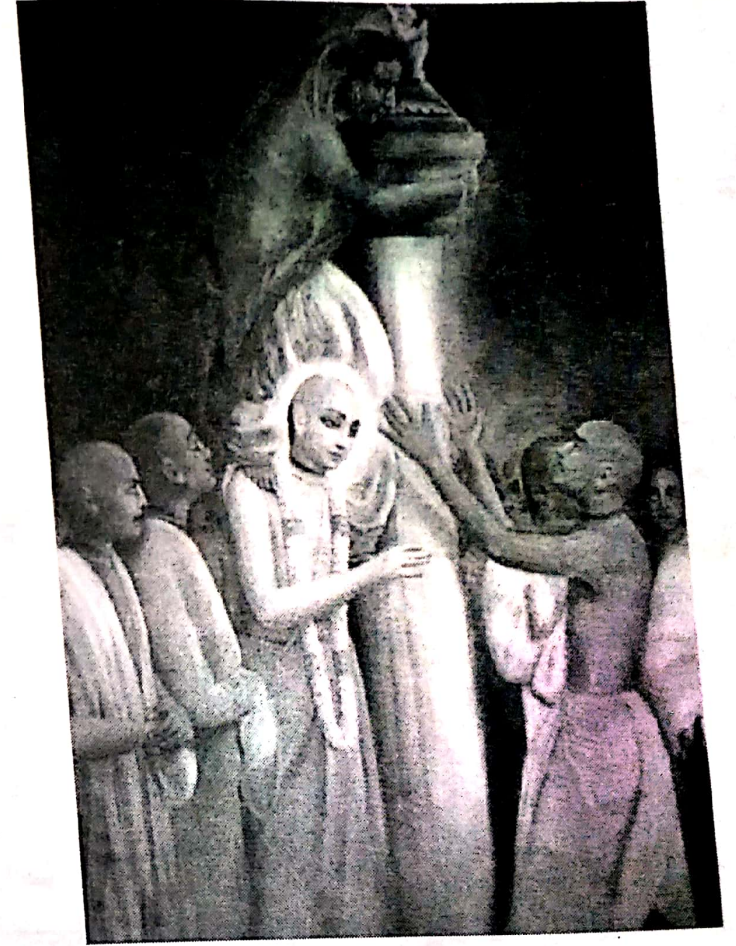
শ্রীশ্রী রাধামাধব

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের শ্রীশ্রীরাধামাধব

প্রধান পূজারী শ্রীপাদ জননিবাস দাস ব্রহ্মচারী অহর্নিশি রাধামাধব এবং অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ সেবা-অর্চনায় নিযুক্ত অত্যন্ত মননশীল ব্যক্তি। সবার প্রিয়। সঙ্গে তাঁর যমজ ভাই শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্ঘ্রি দাস ব্রহ্মচারী প্রভুও। শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্যবর্গের অন্যতম ঐ দুইজনা একই রকম দেখতে। দুইজনেই শ্রীবিগ্রহ সেবায় অত্যন্ত যত্নবান।

শ্রীমায়াপুরের রাধামাধব শ্রীবিগ্রহের ইতিকথা ভগবৎ-দর্শন পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ১৯৭০-৭১ সালে শ্রীল প্রভুপাদ একদল পশ্চিমী শিষ্যদের নিয়ে ভারত পর্যটনে বেরিয়ে ছিলেন আর যেখানেই যেতেন, সেখানে কৃষ্ণভাবনাময় অনুষ্ঠান করতেন। পর্যটনের সময়ে ডালমিয়া নামে এক ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদকে পিতলের তৈরি তিনটি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ দিয়েছিলেন একই ছাঁচে ঢালা। শ্রীল প্রভুপাদ একটি বিগ্রহ পাঠিয়েছিলেন বোস্টনে (শ্রীশ্রীরাধা-গোপীবল্লভ), একটি বার্কলীতে (শ্রীশ্রীরাধা-গোকুলানন্দ) এবং একটি (শ্রীশ্রীরাধা-মাধব) তিনি নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

তাঁরা সকলে মিলে যখন উত্তরপ্রদেশে গোরখপুরে ছিলেন, তখন একদিন সকালে শ্রীল প্রভুপাদ 'জয় রাধা-মাধব'

ভজনটি ভক্তদের শেখাচ্ছিলেন। প্রভুপাদ সেই থেকে যখনই শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ে প্রবচন প্রদান করতেন, তখন নিয়মিতভাবেই ভজনটি গাইতেন।

পর্যটন হয়ে গেলে, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধা-মাধবকে কলকাতা মন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন। যখন আমাদের প্রথম শ্রীগৌরপূর্ণিমা উৎসব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস) শ্রীমায়াপুরে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, শ্রীশ্রীরাধা-মাধব অনুষ্ঠানে আবির্ভূত হবেন। আমরা একটা মণ্ডপ গড়েছিলাম, আর সেখানেই উৎসবের পৌরোহিত্য করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিরাজ করছিলেন।

যখন অনুষ্ঠান শেষ হল এবং ভক্তরা শ্রীবিগ্রহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন কলকাতায়, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, শ্রীমায়াপুরেই ঐ বিগ্রহ বিরাজ করবেন।

সেই সময়ে ইস্‌কনের সম্পত্তি বলতে একটি মাত্র যে বাড়িটি ছিল, সেটি ছিল বাঁখারি দিয়ে গড়া খড়ে-ছাওয়া একটি অস্থায়ী কুটির মাত্র, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আর তাঁর শিষ্যবর্গ বাস করতেন। শ্রীশ্রীরাধা-মাধব সেই ভবনেই অধিষ্ঠান করতে থাকলেন।

আমি সবেমাত্র আমার দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করেছিলাম যাতে শ্রীবিগ্রহাদির পূজা-অর্চনা করবার অধিকার পাই। আমরা যেহেতু কুটির-ভবনের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের খুবই নিকটে থাকতাম, তাই পূজারী কি করছেন, তা সব কিছুই দেখতে পেতাম।

আমি ভাবতাম, "সারাটা জীবন আমি শ্রীবিগ্রহাদির সেবা করে কাটাব। কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার কী আশ্চর্য উপায় সেই কাজ।"

দিন কয়েক পরেই পূজারী চলে যাবেন ঠিক করলেন, আর তাঁর জায়গায় আমাকেই বেছে নেওয়া হল।

শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের শ্রীবিগ্রহ দুটি ছিল ছোট আকারের, তাই শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন স্থায়ী মন্দিরে বড় শ্রীবিগ্রহ থাকা চাই। শ্রীমাধব হওয়া উচিত ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি আর কালো কষ্টি পাথরের তৈরি; শ্রীরাধারাণী হওয়া উচিত ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং শ্বেত পাথরের তৈরি। তিনি বলেন, তাঁদের ভঙ্গিমা ছোট শ্রীবিগ্রহাদির মতো হতেও পারে।

১৯৭৮ সালে কলকাতায় থাকার সময়ে শ্রীমৎ জয়পতাক স্বামী মহারাজ একবার বিত্তশালী শিল্পপতি এবং ইস্‌কনে ভক্ত শ্রীরাধাপদ দাস প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ প

ভজনটি ভক্তদের শেখাচ্ছিলেন। প্রভুপাদ সেই থেকে যখনই শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ে প্রবচন প্রদান করতেন, তখন নিয়মিতভাবেই ভজনটি গাইতেন।

পর্যটন হয়ে গেলে, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধা-মাধবকে কলকাতা মন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন। যখন আমাদের প্রথম শ্রীগৌরপূর্ণিমা উৎসব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস) শ্রীমায়াপুরে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, শ্রীশ্রীরাধা-মাধব অনুষ্ঠানে আবির্ভূত হবেন। আমরা একটা মণ্ডপ গড়েছিলাম, আর সেখানেই উৎসবের পৌরোহিত্য করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিরাজ করছিলেন।

যখন অনুষ্ঠান শেষ হল এবং ভক্তরা শ্রীবিগ্রহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন কলকাতায়, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, শ্রীমায়াপুরেই ঐ বিগ্রহ বিরাজ করবেন।

সেই সময়ে ইস্‌কনের সম্পত্তি বলতে একটি মাত্র যে বাড়িটি ছিল, সেটি ছিল বাঁখারি দিয়ে গড়া খড়ে-ছাওয়া একটি অস্থায়ী কুটির মাত্র, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আর তাঁর শিষ্যবর্গ বাস করতেন। শ্রীশ্রীরাধা-মাধব সেই ভবনেই অধিষ্ঠান করতে থাকলেন।

আমি সবেমাত্র আমার দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করেছিলাম যাতে শ্রীবিগ্রহাদির পূজা-অর্চনা করবার অধিকার পাই। আমরা যেহেতু কুটির-ভবনের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের খুবই নিকটে থাকতাম, তাই পূজারী কি করছেন, তা সব কিছুই দেখতে পেতাম।

আমি ভাবতাম, "সারাটা জীবন আমি শ্রীবিগ্রহাদির সেবা করে কাটাব। কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার কী আশ্চর্য উপায় সেই কাজ।"

দিন কয়েক পরেই পূজারী চলে যাবেন ঠিক করলেন, আর তাঁর জায়গায় আমাকেই বেছে নেওয়া হল।

শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের শ্রীবিগ্রহ দুটি ছিল ছোট আকারের, তাই শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন স্থায়ী মন্দিরে বড় শ্রীবিগ্রহ থাকা চাই। শ্রীমাধব হওয়া উচিত ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি আর কালো কষ্টি পাথরের তৈরি; শ্রীরাধারাণী হওয়া উচিত ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং শ্বেত পাথরের তৈরি। তিনি বলেন, তাঁদের ভঙ্গিমা ছোট শ্রীবিগ্রহাদির মতো হতেও পারে।

১৯৭৮ সালে কলকাতায় থাকার সময়ে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ একবার বিত্তশালী শিল্পপতি এবং ইস্‌কনের ভক্ত শ্রীরাধাপদ দাস প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ প্রভু

তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, স্বপ্নে তিনি এক সাধুকে দেখেন, তিনি বলেন, "আমাকে চিনতে পারো?"

রাধাপদ উত্তর দেন, "না।"

সাধুটি বলেন, "কিছুদিন আগে তুমি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলে এবং আমি এসেছি, সেটি মিটিয়ে দিতে এসেছি।" রাধাপদ বলেন, "কোনও সাধুকে টাকা দিয়ে থাকলে, আমি তো সেটা আবার ফিরিয়ে নেবার আশা করি না। না, ও আমি নিতে পারব না।"

সাধুটি বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ না তো?

রাধাপদ উত্তর দেন, "না।"

অকস্মাৎ সাধুটি একজন বৃদ্ধ মানুষের রূপ ধারণ করলেন।

রাধাপদ প্রভু তখন বলে ওঠেন, "এবার আপনাকে আমি চিনেছি। আপনি শ্রীল প্রভুপাদ।"

শ্রীল প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন, "এখন আমার শিষ্যদের সমস্যা চলছে। কিছুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এখন তোমাকে সাহায্য করতে হবে তাদের।"

এই স্বপ্নের ফলে, শ্রীরাধপদ প্রভু বলেন যে, তিনি ইস্‌কনের জন্য শ্রীবিগ্রহাদি কিনে দিতে চান। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়- যদি তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের বড় বিগ্রহের জন্য টাকা

দেবেন কি না, তাতে তিনি রাজী হয়ে যান।

শ্রীবিগ্রহগুলি জয়পুরে সেখানকার নামকরা ভাস্কর পরিবার পাণ্ডেরা খোদাই করে দিয়েছিল। একদিন বিড়লা পরিবারের একজন (ভারতের সব চেয়ে ধনী পরিবার) এসেছিলেন এর শ্রীবিগ্রহগুলি দেখে ভাল লেগে গিয়েছিল। তিনি সেই বিগ্রহগুলির জন্য ১ লাখ রুপি দিতে চান, সেই সময়ে ও গুলির দাম ডলার হিসাবে প্রায় ১২ হাজার ডলার-ইস্‌কন যা দিতে চেয়েছিল, তার থেকেও ওদের অনেক বেশি দাম। পাণ্ডেরা ঐ বিগ্রহগুলি তাদেরকে বিক্রি করতে রাজী হয়নি, তবে বুঝিয়ে বলে যে, ঐগুলি ইস্‌কনের আনুকুল্যে তৈরি হচ্ছে, এমন কি- ঐ শ্রীবিগ্রহগুলিকে কোনও দিনই সুষ্ঠুভাবে তৈরি করতে পারবে না।

খোদাই কর্মীদের মধ্যে একজন ছিল, সে ভক্তদের বলত যে, এ যাবৎ সে যত কাজ করেছে, তার মধ্যে এখানেই পাথরগুলি তার কাছে অন্য সব জায়গার থেকে পৃথক ধরনের মনে হয়েছে। এ রকম পাথরে এর আগে কোনও দিন কাজ করেনি। সে বলেছিল, "আমরা যখন খোদাই করতে থাকি, ততক্ষণ শ্রীবিগ্রহগুলি থেকে এক সুন্দর ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দ শুনি।"

খোদাই শিল্পীরা শ্রীবিগ্রহগুলিতে শেষপর্বে যখন পালিশ

করছিল, তখন একটা সাদা সুতো শ্রীমাধবের অঙ্গ ঘিরে দেখা যাচ্ছিল। যেমন ব্রাহ্মণেরা শুভ উপবীত ধারণ করে, সেইরকম। তারপর কপালেও দুটি রেখা চিহ্ন দেখা যায়, ঠিক তিলক সেবার মতো।

১৯৮০ সালে শ্রীগৌরপূর্ণিমা উৎসবকালে ঐ বিগ্রহাদি বসানো হয়েছিল। রাধাপদ প্রভু সেই সময়ে অষ্টগোপসখীদের বিগ্রহ খোদাইয়ের আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। চারটি ১৯৮৬ সালে এবং বাকী চারটি ১৯৯২ সালে অধিষ্ঠিত হন।

আমাদের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে বলা হয়েছে যে, যখনই আমরা কোনও মন্দির দর্শন করি, কখনই শ্রীবিগ্রহের প্রীতিসাধনে আমাদের কিছু না-কিছু নিবেদন করতে হয়। শ্রীধাম মায়াপুরের মতো কোনও পূণ্যপবিত্র ভূমিতে এসে শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানার্থে কোনও প্রীতি উপহার যিনি অর্পন করেন, তিনি সুনিশ্চিতভাবে কোনও বিশেষ কৃপালাভ করে থাকেন।

তাই আপনি যদি শ্রীমায়াপুরে তীর্থদর্শনে আসবার কথা ভেবে থাকেন, কিংবা যদি জানতে পারেন যে, কেউ যেতে চাইছেন, তা হলে সেখানে ভক্তবৃন্দ যে সব নিবেদন সামগ্রী তথা নৈবেদ্যের কথা ভেবে থাকেন, সেই রকম কয়েকটি জিনিষের পরামর্শ দিতে চাই, যেমন-ঘি, বাদাম, নারকেল, মধু,

জাফরান, শুকনো ফল ইত্যাদি। অনেকে নানা ধরনের পুঁতি (গুটি) নিবেদন করে থাকেন। পুঁতিগুলি যে কোনও রঙের, কাঁচের বা স্ফটিকের তৈরি হতে পারে- ছোট শ্রীবিগ্রহাদির জন্য ৪-৭ মিমি মাপের, গোপিকাদের উদ্দেশ্যে ১০-১৫ মিমি মাপের এবং বড় আকারের শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের জন্য ১৫-৪০ মিমি মাপের, আর তা ছাড়া ঐ রকম মাপের সোনা, রূপা এবং সাদা মুক্তার পুঁতিও নিবেদন করা চলে। একবার আমি শ্রীবিগ্রহকক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই সময়ে তিনি শ্রীবিগ্রহগুলির দিকে তাকিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "ওরা নৃত্য করছেন।"

আর একবার তিনি বলেন, "তুমি দেখ-কিভাবে রাধারাণী দাঁড়িয়ে আছেন এমনি করে- " (শ্রীরাধিকার প্রসারিত হাতখানির মতো অনুকরণ করে) "যেন কিছু এগিয়ে দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে? কখন ও বা রাধারাণী তাঁর হাতখানি এইভাবে ওপরে তুলে থাকেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। যখন তিনি ঐরকম, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তখন তিনি কখনই ছেড়ে যেতে পারেন না।"

একবার এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিল, "শ্রীল প্রভুপাদ, আমরা এই ধানক্ষেতে বসে থাকি, আর আপনি আমাদের বলছেন

একটা মহানগরী গড়তে। কোথা থেকে এত টাকা আসবে বলুন তো?"

শ্রীল প্রভুপাদ হেসেছিলেন। "তোমরা সব সময়ে দুশ্চিন্তা করছ কোথা থেকে টাকা আসবে। এই তো এখানে আমাদের রাধা-মাধব রয়েছেন। 'মাধব' মানে লক্ষ্মীপতি। তোমরা শুধুই ভালভাবে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের আরাধনা কর, আর তাঁদের কৃপাতেই সব কিছু এসে যাবে। টাকার জন্যে তোমাদের দুর্ভাবনা করতে হবে না।"

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত ভক্তিভরে ভগবানের কমনীয় মূর্তি দর্শন না হয়। ততদিন পর্যন্ত দুর্মতি মানুষ সংসার ভ্রমণ করতেই থাকে।

প্রণতি নিবেদন ঃ পুরুষেরা সাষ্টাঙ্গে, মহিলারা পঞ্চাঙ্গে, শ্রীবিগ্রহকে নিজের বামদিকে রেখে ভক্তিভরে প্রণতি নিবেদন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে শরণাগত-পালক শ্রীহরিকে যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে প্রণতি নিবেদন করেন, তাঁদেরকে যাতনাময় ভবসাগরে পতিত হতে হয় না। যদি কখনও পতিত হয় তবে শ্রীহরি তাঁদেরকে পরিত্রাণ করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্দেশ দিচ্ছেন 'মাম্ নমস্কুরু'-আমাকে প্রণতি নিবেদন করো। পদ্মপুরাণে যমরাজের উক্তি যে, "যে ব্যক্তি মন্দিরে এসে প্রভুর পোশাক-পরিচ্ছদ আদি লক্ষ্য করে,

মন্দিরের কারুকার্য দর্শন করে, কিন্তু প্রভুকে প্রণাম করে না, বন্দনা করে না, তার নরকবাস হয়।" অনেকে শুয়ে পড়ে মাথা ঠুকাতে থাকে, অনেক গড়াগড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। হরিভক্তিবিলাসে সেরকম করতে নিষেধ করা হয়েছে।

নৃত্য-কীর্তন ঃ মন্দিরে এসে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গল্প করা উচিত নয়। শান্তভাবে বসে হরিনাম জপ করতে হয়। অন্যথায় নৃত্য-কীর্তন করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন-'নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।' শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, 'মানুষ সাধারণত নৃত্য-কীর্তনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোস্বামীগণের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য লিখছেন, কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ এই পন্থার অনুসরন করেছেন। নৃত্য কীর্তন জড় জগতের বস্তু নয়। তা চিন্ময় ক্রিয়া। যিনি যতই এই নৃত্য কীর্তনে যোগদান করবেন তিনি ততই ভগবৎ প্রেমামৃত আস্বাদন করবেন।' দ্বারকা মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, প্রফুল্ল মনে পরম ভক্তি সহকারে সযত্নে সমধিক নৃত্য করলে নৃত্যকারীর শত শত জন্মের পাতক ভস্মীভূত হয়।

ভগবৎ কথা শ্রবণ ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীপাদ বলেছেন, 'ভগবানের কথা শুনলে ভোগবাসনা থেকে মুক্তি হয়। ভগবৎ

কথায় শ্রদ্ধাবান জনই জড়ভোগবাসনা যে দুঃখাত্মক তা জানতে পারেন। ব্যবহারিক কাজে যত সব দুঃখপ্রদ ভাব আসে, সেগুলি ত্যাগ করে ভক্ত ভগবৎ সেবা পরায়ণ হয়। ভগবৎ সেবায় প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অমঙ্গল নেই। ভোগ প্রবৃত্তিতে যত অসুবিধা। ভোগ ও ভক্তি বিপরীত জাতীয়।'

পূজা-অর্চনা ঃ শ্রীনারদ মুনির উক্তি, 'গাছের গোড়ায় জল দিলে তার ডালপালা প্রভৃতি সতেজ ও পুষ্ট হয়। পেটে খাবার দিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পোষণ হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করলে সমস্ত দেবদেবীর তৃপ্তি সাধিত হয়।' মহারাজ নিমির প্রতি কবি যোগেশ্বরের উক্তি, 'শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাতে সমস্ত ভয় দূর হয়, সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয়। সংসারে দেহ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুতে আত্মীয় জ্ঞান করে যারা সবসময় উদ্বিগ্ন চিত্ত থাকে, তাদেরও সমস্ত উদ্বেগ প্রশমিত হয়।' অঙ্গিরা ঋষির বাক্য, 'যদি উৎকৃষ্ট বস্তু পেতে চাও, তবে শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা কর।'

শ্রীশ্রী নৃসিংহদেব

শ্রীধাম মায়াপুরে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব বিগ্রহ

১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চ, রাত্রি ১২.২০ মিনিটে গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ৩৫ জনের এক ডাকাত দল শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির আক্রমণ করে। ওরা ভক্তদের হয়রান করে এবং গালাগালিও করছিল। পরিস্থিতি আর ঘোরালো হয় যখন ওরা শ্রীল প্রভুপাদের এবং শ্রীমতী রাধারাণীর বিগ্রহ অপহরণ করতে চেষ্টা করে। ভক্তরা নির্ভয়ে ডাকাতদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যান। শ্রীল প্রভুপাদ আর শ্রীমতী রাধারাণীকে নিয়ে চলে যাবে, তাঁরা কি তাতে নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন? ডাকাতদের প্রতি গুলি ছোঁড়া হয়, কয়েকজন ডাকাত মারাও পড়ে, ওদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শ্রীল প্রভুপাদকে উদ্ধার করা গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীকে আর প্রধান বেদীতে বিদ্যমান দেখা গেল না।

এই ঘটনা ভক্তদের মনকে সত্যিই খুব নাড়া দিয়েছিল। এর একটি স্থায়ী সমাধান করার জন্য বিশেষত পরিচালক মণ্ডলী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মায়াপুরের তৎকালীন যুগ্ম-নির্দেশক ভবানন্দ দাস মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেব প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ প্রদান করেন। যোগপীঠের ভক্তদেরকে যখন ডাকাতরা হুমকি দিচ্ছিল, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সত্বর

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেব প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকে আর কোনও উপদ্রব হয়নি। মায়াপুরের অন্যান্য ভক্তরা অবশ্যই এইভাবে তাঁদের অনুসরণ করতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। পুজারীকে হতে হবে আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, নৃসিংহদেবের পূজো করতে হবে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে। তাঁর পূজো করতে কে প্রস্তুত আছে?

এই সমস্ত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভবানন্দ দাস শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবকে মায়াপুরে আনতে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু আর আমাকে তার কয়েকটি ছবি আঁকতে বললেন। একদিন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি বললেন যে, শ্রীবিগ্রহের পা দুটি হবে বাঁকানো, লাফিয়ে পড়তে প্রস্তুত, তিনি দেখতে হবেন, হিংস্রভাবে এদিক ওদিক দেখছেন এমন, তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি থাকবে একটু বাঁকানো, তাঁর মস্তক থেকে আগুনের মতো শিখা নির্গত হবে। এই ধরনের একটি বিগ্রহের ছবি আমি অঙ্কন করি।

ভক্তরা তা পছন্দ করলেন, পঙ্কজাঙঘ্রী দাস তাঁর অর্চন করতে রাজী হলেন। কলকাতার একজন ধনাঢ্য ভক্ত রাধাপদ দাস ঐ বিগ্রহ নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে চাইলেন। তাতে মনে হল, ইস্‌কন মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ঘটানো একটি বেশ সহজসাধ্য ব্যাপারে হবে। রাধাপদ দাস সত্বর ১,৩০,০০০ রুপি দান

করলেন, তাতে মাস তিনেকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই সব কাজের জন্য আমি দক্ষিণ ভারতে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় খুব সত্বর আমি একজন বিখ্যাত ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এই ভাস্কর কিন্তু শুধু বিগ্রহ খোদাই করেন তা-ই নন, তিনি একজন মন্দিরের ভাস্কর এবং বাস্তুকারও বটে। আমরা যে তাঁকে উগ্রনৃসিংহ বিগ্রহ খোদাই করতে বলব তা না জানা পর্যন্ত তিনি ভালই কথাবার্তা বলছিলেন। এইরূপ বিগ্রহ বানানোর প্রস্তাব দিলে তিনি তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি আরও অনেক ভাস্করের নিকট গেলাম, কিন্তু উত্তর সব জায়গা থেকে একই পাওয়া গেলঃ না। মায়াপুর থেকে দক্ষিণ ভারতে যাতায়াত বেশ কয়েকবার করলাম, ছয় মাস কেটে গেল, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীবিগ্রহরূপে এখনও প্রকট হলেন না।

মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা দেখার জন্য রাধাপদ দাস অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তিনি আমাকে বললেন, আমি যে ভাস্করের নিকট প্রথমে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে যেন আমাদের আবেদনটি পুনরায় পেশ করি। এইবার এ ভাস্করকে যেন একটু সদয় বলে মনে হল, উনি আমাকে শিল্প-শাস্ত্র (মন্দিরের ব্যাস্তুবিদ্যা এবং ভাস্কর্য বিষয়ক বৈদিক শাস্ত্র) থেকে একটি অধ্যায় পড়তে দিলেন, যেখানে বিভিন্ন

বিগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে, শ্রীনৃসিংহদেবের বর্ণনা সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক তিনি জোরে জোরে নিজেও পাঠ করলেন। তাঁর অগ্নিশিখার মতো কেশর বেশ কয়েকটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি আর তাঁর হাঁটু ভাঁজানো, একটি পা সামনের দিকে বাড়ানো, স্তম্ভ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। উনি যখন এই সমস্ত পাঠ করলেন, আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম! তিনি তাতে খুশী হলেন এবং তিনি নিজে শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে বিগ্রহ খোদাই-এর-সহায়ক একখানি ছক করলেন। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি অবশ্য নিজে ঐ বিগ্রহ খোদাই করবেন না। এক সপ্তাহ ধরে তিনি ঐ ছবিটি আকঁলেন, আর তা হয়েছিল খুবই সুন্দর। আমি মায়াপুরে ফিরে এসে ঐ ছবিখানি দেখালাম। প্রত্যেকেই চাইলেন যে, ঐ ভাস্করই যেন ঐ বিগ্রহ খোদাই করেন। তাঁকে রাজী করার জন্য আবার আমাকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হল।

আমি সোজা ঐ ভাস্করের বাড়ীতে গেলাম। বড় উদ্বেগে ছিলাম। শ্রীনৃসিংহদেব যেন কৃপা করে শ্রীমায়াপুর ধামে আমাদের মন্দিরে প্রকট হতে রাজী হন,- এই প্রার্থনা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি? আমি তাঁকে দুটো কথা বলতে না বলতেই উনি বললেন যে, তিনি শ্রীবিগ্রহ খোদাই করবেন।

কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা এক মজার ব্যাপার।

এই ভাস্কর আমাদের অনুরোধ নিয়ে তাঁর গুরুদেব কাঞ্চিপুরমের শঙ্করাচার্যের নিকট গিয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—"করবে না। তোমার বংশনাশ হবে।" মুহূর্ত কাল চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বিগ্রহ খোদাই করতে তোমাকে কে বলছে?" যখন তিনি শুনলেন যে, নবদ্বীপ থেকে হরেকৃষ্ণ ভক্তরা চাইছেন, তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। "ওরা উগ্রনৃসিংহ চাইছে? উগ্রনৃসিংহ খোদাই করা আর তা প্রতিষ্ঠা করার জটিলতা সম্বন্ধে কি ওদের কোন ধারণা আছে? ৩০০০ বৎসর পূর্বে খুবই উন্নত ভাস্করের কেবল এইরূপ বিগ্রহ বানাতেন। মহিশূরে যেতে এক জায়গায় এক ভয়ঙ্কর উগ্রনৃসিংহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নৃসিংহদেব তাঁর কোলের উপর অসুর হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করে তার নাড়িভূড়ী বের করে সারা বেদীর উপর ছড়িয়েছেন। ওখানকার অর্চন ছিল খুব উচ্চ মানের, ওখানে প্রতিদিন হাতী সহযোগে শোভাযাত্রা করে উৎসব হত। কালক্রমে অর্চনে ভাঁটা পড়ে। বর্তমানে ঐ স্থান যেন একটি ভুতুড়ে শহর। পুরো গ্রামটিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেউ ওখানে শান্তিতে থাকতে পারে না। ওরাও কি ওদের ওখানে তেমনটি

চাইছে?"

ভাস্কর বললেন, "ওরা একেবারে নাছোড়বান্দা। প্রতিনিয়ত ওরা আমার নিকট বিগ্রহ সম্বন্ধে কথা বলতে আসছে। মনে হয় ওদের ডাকাত নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে।" বিগ্রহের একটি ছবি তাঁর গুরুদেবের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "ওরা এই বিগ্রহ চাইছে।" তাঁর গুরুদেব ছবিটি নিয়ে খুব ভালোভাবে দেখলেন।

তিনি বললেন, "ও, এ তো উগ্রশ্রেণীর, কিন্তু এই বিশেষ ভাবের বিগ্রহকে বলা হয় স্থানু-নৃসিংহ। এই পৃথিবীর কোথাও উনি নেই। এমনকি স্বর্গে দেবতারাও এই রূপের আরাধনা করেন না। হ্যাঁ, এই বিগ্রহ উগ্র শ্রেণীর। উগ্র মানে ভয়ঙ্কর, ভীষণ ক্রুদ্ধ। এই শ্রেণীতে নয় প্রকার রূপ রয়েছে। এঁরা সকলেই খুব ভয়ঙ্কর। এরা যেটা চাইছে স্থানু-নৃসিংহঃ স্তম্ভ থেকে বেরোচ্ছেন। না! এ বিগ্রহ খোদাই করো না। তোমার জন্য তা মঙ্গলজনক হবে না। এ সম্বন্ধে আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

কয়েকদিন পর ঐ ভাস্কর একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তাঁর গুরুদেব এসে তাঁকে বললেন, ওদের জন্য তুমি স্থানু-নৃসিংহ খোদাই করতে পার। পরেরদিন তিনি কাঞ্চিপুরম থেকে লোকমারফৎ প্রেরিত একখানি পত্র পান । ঐ পত্রখানি শঙ্করাচার্য প্রেরিত, তাতে তিনি মন্দির সংস্কার সংক্রান্ত কিছু

উপদেশ প্রদান করেছেন। তার নীচে একটি পাদটিকা ছিল। তাতে লেখা ছিল, "ইস্‌কনের জন্য তুমি স্থানু-নৃসিংহ খোদাই করতে পার।"

ভাস্কর আমাকে ঐ পত্রখানি দেখিয়ে বললেন, "আমার গুরুদেব আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। আপনাদের বিগ্রহ আমি বানিয়ে দেব।" আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠি। আমি উনাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিলাম, আর জিজ্ঞাসা করলাম, বিগ্রহ খোদাই করতে কত সময় লাগবে? তিনি বললেন ছয় মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহ তৈরী হয়ে যাবে। আমি মায়াপুরে ফিরে আসি।

পবিত্র ধামে চারমাস নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আমি ভাবলাম দক্ষিণ ভারতে গিয়ে নৃসিংহদেবের পূজোর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী ওজনের পেতলের জিনিসপত্র কিনে তারপর বিগ্রহ নিয়ে ফিরব। ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত, সেই যাত্রা ছিল সুব্যবস্থিত ও নির্বিঘ্নের। আমি উনাকে বললাম, পূজোর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র কেনা হয়ে গিয়েছে, আমি বিগ্রহ নিতে এসেছি। ভাস্কর আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, আমি বোধ হয় বড় নির্বোধ, উনি বলে উঠলেন, "কি বিগ্রহ? আমি এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত শিলা-ই পাইনি।" আমি তো তা ভেবে উঠতেই পারছিলাম না। আমি বললাম,

"আপনি আমায় বলেছিলেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবেন।" উনি বললেন, "আমি আমার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখব, শিলা পাওয়ার ছয় মাস পরে প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহ প্রস্তুত হয়ে যাবে।" কথাগুলো উনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, কিন্তু এত দেরী হওয়ার কারণ কী তা আমি বুঝতেও পারছিলাম না আর তা মেনে নিতেও পারছিলাম না। আমি হতাশ হয়ে প্রতিবাদ করলাম, "সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে কত বড় বড় শিলাখণ্ড রয়েছে। সমস্যাটা কোথায়?" শিক্ষক যেভাবে তাঁর কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের দিকে দেখতে থাকেন, উনি যেন আমার দিকে সেইভাবেই দেখছিলেন, উনি সুচিন্তিত ভাবে বললেন, "আমি কোনও উদুখল বানাচ্ছি না। আমি শ্রীবিগ্রহ বানাচ্ছি। শাস্ত্র আমাদের বলেন যে, বিষ্ণুবিগ্রহ বানাতে কেবল জীবন্ত শিলা ব্যবহার করা যাবে। যে শিলাখণ্ডের সাতটি স্থানে আঘাত করলে প্রতিটি স্থান থেকে শাস্ত্রানুসারে শব্দ উৎপন্ন হবে, সেই শিলা হবে যথার্থ। আবার আর একভাবেও ঐ শিলা জীবন্ত কি না নির্ধারণ করা যায়। এক রকমের পোকা যদি সেই শিলার এক প্রান্ত থেকে খেয়ে ছিদ্র করে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে, আর তাতে ঐ ছিদ্র বরাবর থাকে, তাহলে সেটি যে জীবন্ত শিলা তাতে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। এই ধরনের শিলাখন্ড থেকেই কেবল আপনার নৃসিংহদেব বানানো যাবে। এইরূপ শিলা

থেকে খোদাই করা শ্রীবিগ্রহের মধ্যে যথার্থ বিগ্রহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হবে। ধৈর্য ধরুন। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে এক খণ্ড ছয় ফুটের শিলা অনুসন্ধান করছি।”

আমি চমৎকার, আবার একটু উদ্বিগ্নও। মায়াপুরের ভক্তরা খুব সত্বর বিগ্রহ আসবে বলে চেয়ে আছে। আমি এখন তাঁদের নিকট কিভাবে এই ‘জীবন্ত শিলা’ অনুসন্ধান ব্যাখ্যা করব? তাঁরা হয়তো নৃসিংহদেবের মর্মর বিগ্রহই চেয়ে বসবেন। আমি ভাবলাম প্রহ্লাদ মহারাজের মূর্তির ব্যাপারে ভাস্করের সঙ্গে আলোচনা করব। “মাফ করবেন, আমি গতবারে যখন আপনার কাছে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেছি, আমরা প্রহ্লাদ মূর্তিও চাই। আমরা প্রহ্লাদ-নৃসিংহদেব অর্চন করতে চাই। আপনার কী অভিমত?

ভাস্কর নিশ্চিত করে বললেন, “আমার মনে হয় না তা সম্ভব হবে।” আমি হতবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। উনি মুচকি হেসে বললেন, “আপনারা চান সব কিছু হবে যথাযথ শাস্ত্র অনুসারে। আপনাদের নৃসিংহদেব হবেন চার ফুট উঁচু। তুলনামূলকভাবে হিসাব করলে আপনার প্রহ্লাদ মহারাজ হবেন জীবানুর আকারের।”

আমি বললাম, “আমরা চাই এক ফুট উঁচু প্রহ্লাদ মহারাজ।” ভাস্কর বললেন, “বেশ, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আপনাদের নৃসিংহদেব হবেন ১২০ ফুট উঁচু।” প্রহ্লাদ মহারাজের আকার নিয়ে আমরা অনেক যুক্তিতর্ক করতে লাগলাম। অবশেষে ভাস্কর মশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে এক ফুট উঁচু প্রহ্লাদ মহারাজ বানাতে রাজী হলেন। এবার মায়াপুরে ফিরে গেলে আমি কিছু সুখবর দিতে পারব।

দু’মাস পরে আমি দক্ষিণ ভারতে ফিরে আসি। অগ্রগতি কিছুই হয়নি। প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ দিনে একবার করে আমি দক্ষিণ ভারত আর মায়াপুর যাতায়াত করতে থাকলাম। তারপর শিলা পাওয়া গেল, আর ঐ ভাস্কর যেন তখন একজন ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছেন। এক সপ্তাহের ওপর উনি বাড়ীতেই যাননি। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, তিনি ঐ শিলাখণ্ডই নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। উনার হাতে চক্ ছিল কিন্তু তা দিয়ে কিছুই আঁকেননি। তিনি তাঁর শ্রমিকদেরও কেবলমাত্র শিলাখণ্ডকে আয়ত করতে বাকী অংশগুলি বাদ দিতে বলেছিলেন। পরের বারে যখন ওনার নিকট গেলাম, তখন উনি ঐ শিলার ওপর একটি ছক্ করেছেন মাত্র। এই ব্যাস। আমি তো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মায়াপুরের পরিচালক মণ্ডলী এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

আমি হতাশ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি নিশ্চিত যে, ছয় মাসের মধ্যে আপনি বিগ্রহের কাজ শেষ করতে পারবেন?"

উনি বললেন, "ব্যস্ত হবেন না, কাজ হয়ে যাবে।" আমি মায়াপুরে ফেরা মাত্রই আবার দক্ষিণ ভারতে যেতে হল, বিগ্রহের আরও কিছু বিস্তারিত ব্যাপার, সেগুলি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেই নিয়ে। আমি ঐ ভাস্করকে দেখলাম উনি গভীর মনোযোগ এবং যত্ন সহকারে এবং নিজে হাতেই বিগ্রহ খোদাই করছেন। সেই পর্যায়ে সেটি আর শিলা নেই, বিগ্রহের আকার এসে গেছে। ভাস্কর তখন বিগ্রহের বাহুতে অনন্ত বানাতে শুরু করেছেন। আমি তা দেখে সুখী এবং প্রভাবিত হয়েছিলাম। বিগ্রহ সম্পূর্ণ করতে ঐ ভাস্করের প্রায় এক বছরের একটু বেশী সময় গেলেছিল। বিগ্রহ সম্পূর্ণ করেই আমাকে উনি খবর দেননি, উনি কয়েক দিনের জন্য কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন ভেবেছিলেন। তখন ছিল বর্ষাকাল, কিছু লোক উনাদের বাড়ীতে বেড়াতেও এসেছিলেন, তাই তিনি ভেবেছিলেন, নৃসিংহদেবকে ঐ চালাঘরে তালা মেরে রাখলেই নিরাপদ। দু'দিন বাদে তাঁর একজন প্রতিবেশী ছুটে এসে খবর দিলেন যে সেই চালাঘরে আগুন লেগেছিল। প্রচুর বৃষ্টি হয়ে সব কিছু ছিল ভেজা, কিন্তু নারকেল পাতার ছাউনিতে আগুন ধরে গেছে। তিনি ছুটে

গিয়ে দেখলেন নৃসিংহদেব অক্ষত, কিন্তু ছাউনি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উনি আমায় ফোন করেছেন, "দয়া করে আপনার বিগ্রহ নিয়ে যান। উনি সব পুড়িয়ে ফেলছেন। উনি যে এক্ষণই যেতে চাইছেন এ থেকে বোঝা যাচ্ছে।"

উৎসাহের সঙ্গে আমি ভারতে গেলাম, একটি লরী ভাড়া করলাম, তাতে অর্ধেকটা বালি দিয়ে ভর্তি করা হল। আমি ভাস্করের কার্যালয়ে এসে ভাবলাম এরপর কাজগুলো সহজ হবে। আমি ভুলেই গেছিলাম যে, নৃসিংহদেব ভীষণ ওজনদার ব্যক্তিত্বঃ ওনার ওজন এক টন! দু'তিন ঘন্টা চেষ্টা চালানোর পর আমরা বিগ্রহকে ছাউনি থেকে নিরাপদ লরীতে ওঠালাম। নিরাপদে রাজ্য সীমানাগুলি পার করতে আমাদের পুলিশের অনুমোদন, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর বিভাগের অনুমোদন পত্র, নৃতত্ত্ব বিভাগের নির্দেশক আর সেই সঙ্গে তামিলনাড়ুর শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হয়েছিল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দস্তখত করার আগে প্রতিটি আধিকারিক বিগ্রহ দর্শন করতে চাইছিলেন। নৃসিংহদেবের দর্শন করা মাত্রই ওঁরা খুব সহযোগী এবং সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছিলেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে গিয়েছি–ভারত সরকারের আমলাদের থেকে এতটা সহযোগিতা পাওয়া ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। মায়াপুরে ফিরে আসার সময়ও আমাদের ভ্রমণ ছিল

আমি হতাশ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি নিশ্চিত যে, ছয় মাসের মধ্যে আপনি বিগ্রহের কাজ শেষ করতে পারবেন?"

উনি বললেন, "ব্যস্ত হবেন না, কাজ হয়ে যাবে।" আমি মায়াপুরে ফেরা মাত্রই আবার দক্ষিণ ভারতে যেতে হল, বিগ্রহের আরও কিছু বিস্তারিত ব্যাপার, সেগুলি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেই নিয়ে। আমি ঐ ভাস্করকে দেখলাম উনি গভীর মনোযোগ এবং যত্ন সহকারে এবং নিজে হাতেই বিগ্রহ খোদাই করছেন। সেই পর্যায়ে সেটি আর শিলা নেই, বিগ্রহের আকার এসে গেছে। ভাস্কর তখন বিগ্রহের বাহুতে অনন্ত বানাতে শুরু করেছেন। আমি তা দেখে সুখী এবং প্রভাবিত হয়েছিলাম। বিগ্রহ সম্পূর্ণ করতে ঐ ভাস্করের প্রায় এক বছরের একটু বেশী সময় গেলেছিল। বিগ্রহ সম্পূর্ণ করেই আমাকে উনি খবর দেননি, উনি কয়েক দিনের জন্য কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন ভেবেছিলেন। তখন ছিল বর্ষাকাল, কিছু লোক উনাদের বাড়ীতে বেড়াতেও এসেছিলেন, তাই তিনি ভেবেছিলেন, নৃসিংহদেবকে ঐ চালাঘরে তালা মেরে রাখলেই নিরাপদ। দু'দিন বাদে তাঁর একজন প্রতিবেশী ছুটে এসে খবর দিলেন যে সেই চালাঘরে আগুন লেগেছিল। প্রচুর বৃষ্টি হয়ে সব কিছু ছিল ভেজা, কিন্তু নারকেল পাতার ছাউনিতে আগুন ধরে গেছে। তিনি ছুটে

গিয়ে দেখলেন নৃসিংহদেব অক্ষত, কিন্তু ছাউনি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উনি আমায় ফোন করেছেন, "দয়া করে আপনার বিগ্রহ নিয়ে যান। উনি সব পুড়িয়ে ফেলছেন। উনি যে এক্ষণই যেতে চাইছেন এ থেকে বোঝা যাচ্ছে।"

উৎসাহের সঙ্গে আমি ভারতে গেলাম, একটি লরী ভাড়া করলাম, তাতে অর্ধেকটা বালি দিয়ে ভর্তি করা হল। আমি ভাস্করের কার্যালয়ে এসে ভাবলাম এরপর কাজগুলো সহজ হবে। আমি ভুলেই গেছিলাম যে, নৃসিংহদেব ভীষণ ওজনদার ব্যক্তিত্বঃ ওনার ওজন এক টন! দু'তিন ঘন্টা চেষ্টা চালানোর পর আমরা বিগ্রহকে ছাউনি থেকে নিরাপদ লরীতে ওঠালাম। নিরাপদে রাজ্য সীমানাগুলি পার করতে আমাদের পুলিশের অনুমোদন, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর বিভাগের অনুমোদন পত্র, নৃতত্ব বিভাগের নির্দেশক আর সেই সঙ্গে তামিলনাড়ুর শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হয়েছিল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দস্তখত করার আগে প্রতিটি আধিকারিক বিগ্রহ দর্শন করতে চাইছিলেন। নৃসিংহদেবের দর্শন করা মাত্রই ওঁরা খুব সহযোগী এবং সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছিলেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে গিয়েছি–ভারত সরকারের আমলাদের থেকে এতটা সহযোগিতা পাওয়া ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। মায়াপুরে ফিরে আসার সময়ও আমাদের ভ্রমণ ছিল

শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্ন, কারণ আমাদের রক্ষক আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

সাধারণত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন ভাস্কর নিজে গর্ভগৃহে গিয়ে বিগ্রহের চক্ষু খোদাই করেন। একে বলে নেত্রোন্মিলনম্ (নেত্রদান)। আমাদের নৃসিংহদেবের ক্ষেত্রে তা ছিল এক ব্যতিক্রম, ভাস্কর ইতিমধ্যেই নেত্রদান করে দিয়েছেন। তিনি শুধু নেত্রদানই করেননি, তিনি বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করেছেন, তাতে একটু পূজা এবং আরতিও করতে হয়। এই জন্যই সমস্ত কাগজপত্র এত সত্বর পাওয়া গিয়েছিল আর পরমেশ্বর ভগবানকে নিয়ে আসাও খুব সহজ হয়েছিল–তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি উপস্থিত ছিলেন। আর ভগবান নৃসিংহদেবকে 'না' বলবে এমন সাধ্য কার?

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান ছিল খুব সোজা, তাতে তিনদিন লেগেছিলঃ ২৮-৩০ শে জুলাই ১৯৮৬। আমার মনে হয়েছিল এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বুঝি সহজে হয়ে গেল। কাঞ্চিপুরমের শঙ্করাচার্যের গম্ভীর সতর্কবাণী আমাকে গভীরভাবে চিন্তিত করেছিল। কিন্তু উচ্চ, প্রাণবন্ত কীর্তন শ্রবণ করে আমি শান্তি অনুভব করেছিলাম। কলিযুগের একমাত্র যথার্থ ঐশ্বর্য সংকীর্তন যজ্ঞ সম্পূর্ণ ব্যাপারটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাতে আমি উজ্জীবিত ও সন্তুষ্ট বোধ

করেছিলাম। এতদিনে সংকীর্তন আন্দোলনের রক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে নিজেকে প্রকাশ করলেন। জয় শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান কি-- জয়! প্রহ্লাদ মহারাজ কি– জয়!!

লেখক - শ্রী আত্মতত্ত্ব দাস

ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব

"মায়াপুরে শ্রীশ্রী পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ"

সূর্যকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে রেখে হাড় কাঁপানী শীতের আগমন। সমগ্র মায়াপুরও যেন সে চাদরের অংশীদার। কিন্তু সেই শীত যখন প্রস্থান নিল, যেন সেই উষ্ণ হাওয়ার দিনের পুনরাগমন ঘটেছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের এমনই খানিকটা উষ্ণ এক সকালে আগমন ঘটেছে আরেক জনের, তাঁর আগমনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যেন হইহই রব। তিনি হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তবে তিনি একা নন সাথে আগমন ঘটেছে তাঁর পার্ষদদেরও। এসময় সবার মুখে ঐ একটিই কথা, 'শ্রী পঞ্চতত্ত্ব আজ আসছেন'।

ভক্তরা সবাই ঝড়ের গতিতে মন্দিরের প্রধান তোড়ন হয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত সড়কের ওপর এসে হাজির। সবাই হাঁটতে শুরু করল এবং তাদের গন্তব্যস্থল ছিল, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান, যোগপীঠ। ভক্তরা সবাই যোগপীঠের তোড়নগুলোর সামনে জড়ো হয়, যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহের আগমন ঘটবে। উদ্বিগ্ন এবং কৌতূহল ভক্তরা সবাই প্রতীক্ষা করছে, কখন তাদের প্রাণপ্রিয় বিগ্রহগুলি এসে পৌঁছবে। অবশেষে খানিকক্ষণ পর অনেক দূর থেকে ভক্তদের কীর্তনের সুর ভেসে এল।
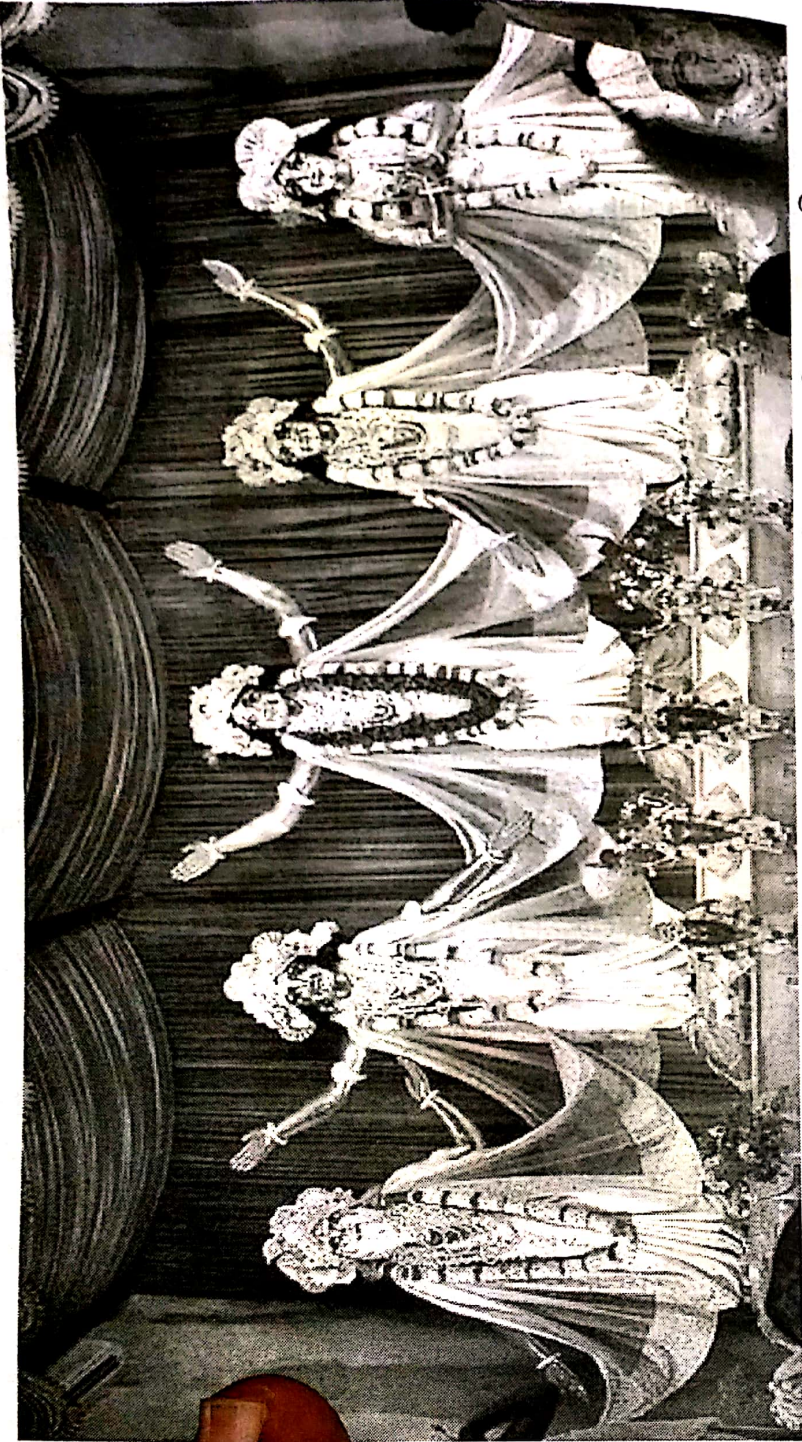
বিগ্রহকে ট্রাকে করে নিয়ে আসতে শত শত ভক্তদের যে বিশাল দলটি গিয়েছিল, তাদেরই গাওয়া কীর্তনের সেই সুমধুর সুর এখন দূর থেকে ভেসে আসছে।

অবশেষে বিগ্রহ সমন্বিত সেই বিশাল শোভাযাত্রাটি সবার দৃষ্টিগোচর হবে, প্রতীক্ষারত ভক্তরা তা দর্শন করে দিব্য আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। বিশাল শোভাযাত্রাটি দেখে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। বাঁশের অগ্রভাগে আটকানো রং-বেরঙের অনেক পতাকা উড়ছে। সেইসাথে ট্রাকের চারপাশে ভক্তদের স্রোত, সত্যিই এক মনোরম দৃশ্য।

এদিকে যোগপীঠে অপেক্ষারত ভক্তরা বিগ্রহসহ ভক্তদের শোভাযাত্রাটি দর্শন করা মাত্রই ভূমিতে লুটিয়ে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করলেন। ট্রাক চালক পাঁচদিন ধরে গাড়ি চালিয়ে দক্ষিণ ভারতের কুম্বকোনাম থেকে এখন অবশেষে মায়াপুরে।

এদিকে আগত শোভাযাত্রাটির সঙ্গে যোগপীঠের ভক্তদের কীর্তন সামিল হলো এবং এটি উত্তরোত্তর আরো বর্ধিত হতে লাগলো। ভক্তরা একে অপরকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সেইসাথে উর্দ্দণ্ড নৃত্যও চলতে লাগল। স্থানীয় গ্রামবাসী ও দোকানীরা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে এই অতি মনোরম শোভাযাত্রাটির উৎসের সন্ধানে ব্যস্ত। যোগপীঠের

পাশেই পাঁচ তলা বিশিষ্ট একটি দালানের নির্মাণকার্য বন্ধ করে শ্রমিকরা বারান্দায় এসে ভিড় করেছে। তাদের মুখমণ্ডলে ছিল বাঁধভাঙ্গা হাসির জোয়ার।

ট্রাকটি ধীরে ধীরে গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। একসময় দৃশ্যমান হয় নিত্যানন্দ প্রভুর একটি হস্ত। অতি সাবধানে আবৃত থাকা সত্ত্বেও আবরণটি খানিকটা খুলে যায়, আর তাতেই ভক্তরা ব্যস্ত হয়ে পরে, তার প্রথম আশীর্বাদ লাভের জন্য। পরম করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দিব্য আঙ্গুলের কিঞ্চিৎ প্রেমময়ী স্পর্শ ভক্তদের আনন্দকে আরো বর্ধিত করছিল।

অবশেষে মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পেছনের প্রবেশদ্বার দিয়ে ট্রাকটি প্রবেশ করে। তখন বিগ্রহের চারপাশে নিরাপত্তাস্বরূপ ভক্তরা অবস্থান করেন। এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের বিগ্রহ মায়াপুরে।

পনেরো শত বছরের ঐতিহ্য শ্রীপঞ্চতত্ত্বের ভ্রমণ শুরু হয়েছিল স্বামীমালায় গ্রাম থেকে, যেখানে স্থপতি দেবসেনাপতি এবং তাঁর পুত্র রাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীকান্তের সুদক্ষ হস্তে বিগ্রহগুলো গড়ে তোলা হয়। পারিবারিকভাবে বিগ্রহ তৈরির এই ঐতিহ্য পনেরো শত বছর পূর্বে রাজা ছোলের আমল থেকে, তিনশত

প্রজন্ম ধরে। রাজা তখন তানজোর জেলা শাসন করতেন এবং তাঁর শাসনামলে চিত্রকর্ম, গানবাজনা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা যায়। তখন তিনি একটি মন্দির নির্মাণের বাসনা করলে উত্তর ভারত থেকে স্থপতিদেরকে (বিগ্রহ খোদাইকারী) পরিবারসহ সেই স্থানে নিয়ে আসেন। মন্দিরটি তৈরি করতে প্রায় ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল যা আজও ঠাঁই দাড়িয়ে রয়েছে ইতহাসের নিদর্শনস্বরূপ এবং সেটি তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মন্দির ছিল। এর গম্বুজটি নির্মাণ করা হয়েছিল একটি পাথর থেকে, যার ওজন ছিল প্রায় আশি টন এবং এটি পুরো মন্দিরকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যেন মন্দিরের ছায়া কখনো মাটিতে স্পর্শ না করে। মন্দিরটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হওয়ার পরও স্থপতিরা সেইস্থানে রয়ে যায় এবং আজও তারা স্বামীমালায় অবস্থান করছেন।

বিগ্রহ তৈরির পূর্বে, অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল; এই বিগ্রহগুলি তৈরির সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ভরত মহারাজ দাস। তিনি প্রথম থেকেই বিগ্রহ তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে রচিত শিল্প শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন।

তিনি একটি প্রধান সমস্যা আবিষ্কার করেন, বাংলার ঐতিহ্য থেকে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের আরাধনার সূত্রপাত। কিন্তু তাঁদের

আরাধনার জন্য কোনো শাস্ত্র নেই। তাই ভরত দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বিগ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্যসূচক ধারণা অর্জন করেন প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বের নবদ্বীপে পঞ্চতত্ত্বের অতীত লীলাবিলাসের লিখিত দলিল থেকে।

কিন্তু এখনও বিগ্রহ সম্পর্কে অনেক বিষয় জানার বাকি, যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিগ্রহের উচ্চতা এবং তাঁদের অঙ্গভঙ্গির বিষয়গুলোও। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে, শ্রীমায়াপুর প্রোজেক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিটি (SMPDC), চৈতন্য চন্দ্রোদয় দাসের প্রস্তাবিত দাঁড়ানোর অঙ্গভঙ্গির ওপর কিছু অঙ্কিত ছবির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উল্লেখ্য, চৈতন্য চন্দ্রোদয় দাস SMPDC এর লন্ডন অফিসে সেবা করতেন।

ভরত মহারাজের শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তার অংকিত নকশা ও মাটির তৈরী শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নমুনা, বিগ্রহ দেখতে কেমন হবে তার একটি শক্তিশালী ধারণা দান করে। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে মায়াপুরের প্রধান পূজারি শ্রীপাদ জননিবাস দাসের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছিলেন। শ্রীপাদ জননিবাস প্রভুর নির্দেশনাসমূহ পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও

ভাবসম্পর্কিত ছিল।

"আমরা শুধু কিছু ফর্মুলা বা কম্পিউটারের ক্যালকুলেশন অনুসারে এ বিগ্রহগুলো তৈরি করিনি।" ভরত মহারাজ বলছিলেন, "শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু প্রতিটি বিগ্রহের মধ্যে ভাব ও ব্যক্তিত্ব স্থাপন করেন; তিনি বিগ্রহের ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যেটি আপনারা প্রতিটি বিগ্রহের মুখমন্ডলে দর্শন করছেন।"

শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু তাঁর দিক্-নির্দেশনার যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য ভরতের উপর নির্ভর করতেন, যিনি পরবর্তীতে বিগ্রহের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্দেশনা অনুসারে মাটির মডেল তৈরি করেছিলেন। তারপর শিল্পীরা মডেলগুলো যথাযথ অনুকরণ করে চূড়ান্ত খোদাই সম্পন্ন করত। এভাবে প্রতিটি বিগ্রহ তৈরি করা হয়েছিল। বিগ্রহের ফাইবার গ্লাস মডেলগুলো পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। প্রধান স্থপতি দেবসেনাপতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নমুনাটি দেখে অনুমোদন করলেন এবং বললেন, এটি যথার্থই দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্র এবং ঐতিহ্য মেনেই তৈরি করা হয়েছে। তিনি এই কার্যটি করতে সম্মতি প্রকাশ করে তাঁর পুত্রদের বললেন, "এই সেবাটি যত্ন সহকারে কর-এটি একটি বিশেষ প্রজেক্ট"। দুঃখজনকভাবে দেবসেনাপতি এর ফলাফলটি দেখে যেতে

পারেননি:

তিনি বিগ্রহ তৈরির কার্যটি শুরু হওয়ার পূর্বেই ২০০২ সালে দেহত্যাগ করেন। দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে যতটুকু সম্ভব এই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী অলংকার অন্তর্ভূক্ত করবেন। তিনি জননিবাস প্রভুকে বলেছিলেন, এই শর্তটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে; অন্যথায় তার বংশধররা অভিশপ্ত হবেন। কেননা স্থপতিরা কখনো বস্ত্রবিহীন বিগ্রহ তৈরি করেন না। শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু এতে সম্মতি দেন। অবশেষে তাই হল।

ভরত মহারাজকে দক্ষিণ ভারত থেকে আনা হয় খোদাই করার প্রতিটি পর্যায়ে যথার্থ উপাদানসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য।

ভরত বললেন, "প্রতিটি পর্যায়ে পরিবর্তন পরিলক্ষিত করছিলাম এবং প্রতিটি ব্যক্তিই প্রয়োজনীয় উপাদান সংযোগের কার্যে জড়িত ছিলেন। আমরা তাপ প্রত্যক্ষ করছিলাম। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে রয়েছে বিভিন্ন ধারণা। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকান উপজাতীয় ঐতিহ্যে বিগ্রহের দীর্ঘ কণ্ঠ থাকাকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে বিগ্রহের জন্য তাঁদের সৌন্দর্যের ধারণাটি বাঙালিদের থেকে ভিন্ন। তাই দক্ষিণ

ভারতীয় স্থপতি এবং পশ্চিমা ভক্তদের যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা এই বিগ্রহগুলো তৈরি করছি।" তিনি মৃদু হেসে এর ফলাফলটি কি তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, "পরিণতিটি অভূতপূর্ব সুন্দর।

২০০১ সালের শেষের দিকে বিগ্রহ তৈরির ব্যাপারটি স্থির অবস্থানে ছিল। গঙ্গা দাস এবং ভাগবতামৃত দাস, উভয়ই এই বিগ্রহ তৈরির প্রজেক্টে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত ছিলেন, তাঁরা সে-সময় সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখনই যথার্থ সময় পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত করার। তাঁরা বিষয়টিকে স্থির অবস্থান থেকে গতিশীল করার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এটি নিয়ে যেতে প্রয়াসী হন।

গঙ্গা দাস ভরতকে বলেন, "আমরা ভাবছিলাম আমরা তো মোটরবাইকে চড়ে দক্ষিণ ভারতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সব ঠিকঠিক হলে এই বিগ্রহগুলি আমরা ওখানেই তৈরি করতে পারি!"

বিগ্রহ তৈরির পুরো বিষয়টিই বাস্তবায়ন হতে অনেক দিন সময় লাগত, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, মূলত এ দুইজন ভক্তের জড়িত থাকার ফলেই এই বিশাল প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়েছে। তারা দেবসেনাপতির সঙ্গে দেখা করেন

এবং দেবসেনাপতি তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণকে মায়াপুরে পাঠান। রাধাকৃষ্ন সবকিছু অবগত হলে, তিনি তাঁর পূর্বের কাজগুলোর কিছু নমুনা ভক্তদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। দেবসেনাপতির অসুস্থতার কারণে বিগ্রহ তৈরির ভারটি অর্পণ করা হয় রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁর ভাই শ্রীকান্তকে। খোদাই প্রস্তুতি শুরু হয় বিশেষ পূজা সম্পাদনের মাধ্যমে। প্রক্রিয়া সর্ম্পকে ব্যক্ত করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ বলেন, "বিগ্রহ খোদাই প্রক্রিয়াটি মনগড়া প্রক্রিয়ায় হয় না। এর সবকিছুই সম্পাদিত হয় সংস্কৃতি অনুসারে।

প্রথমে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকান্তের সাথে তাঁদের পত্নীরা খোদাইকৃত স্থানে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানান। তারপর একটি অগ্নিযজ্ঞের মাধ্যমে পরিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ব্রাহ্মণদের কাছে বর চাওয়া হয় যেন কার্যটি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয়। এরপরে পর্যায়ক্রমে গো-পূজা এবং তুলসী পূজা সম্পাদন করা হয়। অবশেষে অগ্নি দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা সম্পাদিত হয়। কারণ বিগ্রহ তৈরির জন্য অগ্নির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিগ্রহ তৈরির সময়কালীন ৬০ থেকে ১০০ জন ভক্ত নিরন্তর কীর্তন করতে থাকে।

২০০৩ সালের এপ্রিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ তৈরি সম্পন্ন হয়। [illegible] যথাক্রমে সম্পন্ন হয়, নিত্যানন্দ, গদাধর,

অদ্বৈত প্রভু এবং অবশেষে শ্রীবাসের বিগ্রহ। প্রতিটি বিগ্রহের গঠন তৈরি সম্পাদিত হয় অত্যন্ত কঠোরভাবে। জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে শুভ দিন, ঘণ্টা এবং মিনিট ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে নির্ধারণ করা হয়।

গদাধরের বিগ্রহ তৈরির সময় ভারী বৃষ্টিপাত হতে থাকে এবং স্থানটি কাজ করার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। গলিত ধাতুর প্রচন্ড তাপের কারণে ধাতুর মধ্যে এক ফোঁটা জল মিশতে পারবে না; যদি কোনোরকমে মিশে যায় তবে তা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

এজন্যে ভগবানের কিছুটা কৃপার প্রয়োজন ছিল এবং যেন কৃষ্ণ তারই ব্যবস্থা করে দিলেন।

গঙ্গা দাস বলছিলেন, "পুরো আকাশজুড়ে কালো মেঘ এবং অবিরত বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। কিন্তু ঐ বিশেষ নির্মাণ স্থানটি ছিল পুরোপুরিই শুকনো"। ফলে বিগ্রহ তৈরির কার্য দিন-রাত চলতে থাকে। যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্য বাইরের কারো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাওয়া হয় তখন শ্রমিকরা তার নিরর্থকতা প্রকাশ করে: শুধুমাত্র তারা ছাড়া আর কেউই এই বিগ্রহ তৈরির কার্যটি করতে পারবে না! তারা দ্রুতগতিতে কাজ করতে লাগলেন। রাধাকৃষ্ণ বলেন যে, ভাগবতামৃতের তড়িঘড়ির কারণেই বিগ্রহ তৈরির কার্যটি ঠিক

সময়ে সম্পাদিত হয়। তিনি প্রতিদিনই সব পর্যবেক্ষণ করতেন, সবাইকে দ্রুত কাজ করার জন্য উৎসাহ দিতেন। মায়াপুরে ঠিক সময়ে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের আগমনের পেছনে তারই প্রধান ভূমিকা ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে তড়িৎ গতিতে পাঠানো তার ই-মেইলগুলো যে বার্তাটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা হল-মায়াপুর আগমনের উদ্দেশ্যে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ প্রস্তুত।

বিগ্রহগুলি ট্রাকে বহন করা নামানোর কাজগুলো কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, যার জন্য কয়েকদিন লেগে গিয়েছিল। অক্ষতভাবে বিগ্রহ বহন ও নামানোর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন রবি চন্দ্র। কার্যটি তাঁর সামর্থ্য অনুসারে তিনি করতে পেরেছিলেন, অবশ্য এজন্য তাঁর হাতের যথেষ্ট ক্ষতিও হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভুকে ট্রাকে ওঠানোর সময় বিগ্রহ পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে, তিনি হাত দিয়ে প্রায় আড়াই টন ওজনের বিগ্রহকে থামানোর চেষ্টা করেন। যেকোনো ভাবেই হোক তিনি এ প্রচেষ্টায় সফল হলে নিত্যানন্দ প্রভুকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু রবির বাম হাতটি, বিগ্রহের বাম হাতের নীচে চাপা পড়ে। রবির হাতটি উদ্ধারের পর চব্বিশটি সেলাই দিতে হয়। এমনকি তাঁর ডান হাতের একটি আঙুলও ভেঙ্গে যায়। তথাপিও তিনি পরের দিন

আবারও তাঁর নিজ কর্তব্যে ফিরে আসেন।

বিগ্রহের অভিষেক পর্যন্ত পরিশুদ্ধিকরণ অতিবাহিত হল। রাধাকৃষ্ণকে দেখে বিশেষভাবে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তাঁর কার্যে তিনি সন্তুষ্ট কিনা।

তিনি উত্তর দেন, সাধারণত যখন আমরা কোনো কার্য শুরু করি, আমদের পিতা সর্বদা আমাদের পরিচালনা করতেন। একটি কার্য শেষ হওয়ার পর আমরা তার সম্মতি জানতে চাইতাম। কিন্তু এখন আমাদের পিতা নেই, তাই আমরা চেষ্টা করেছিলাম তাঁর উপস্থিতিতে আমরা পূর্বে যা করেছিলাম তাঁর চেয়েও যেন এ কার্যটি ভালোভাবে সম্পাদিত হয়; যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমানে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের কার্যে তিনি সন্তুষ্ট।”

তিনি আরো বলেন যে, বিগ্রহের পরিপূর্ণতা এবং প্রথম বিগ্রহ দর্শনের সময় ভক্তদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর জন্য ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা।

“আমি বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু যখন দ্বার উন্মোচিত হল এবং ভক্তরা প্রবল আনন্দে চিৎকার করছিলেন, আমি ভাবছিলাম আমার পেছনে দাঁড়ানোই উচিত। কেননা বিগ্রহ দর্শনের পর ভক্তদের গভীর আনন্দময় মুখগুলো আমি দর্শন করতে চেয়েছিলাম।

অভিষেক অনুষ্ঠান বিষয়ে রাধাকৃষ্ণ বলেন, “আমি এ পর্যন্ত যত বিগ্রহ অভিষেক অনুষ্ঠান দর্শন করেছি, তার মধ্যে এটিই হল সর্বোৎকৃষ্ট।”

তিনি ভক্তদের প্রতিক্রিয়া দেখে বিস্মিত হয়েছিলেনঃ ভক্তদের চোখগুলো থেকে দিব্য আনন্দের জলধারা প্রবাহিত হচ্ছিল এবং তাদের হরিনাম কীর্তন ও আনন্দদায়ক মুখগুলো প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহের প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করছিল।

মায়াপুরে ভক্তদের হাতে বিগ্রহগুলো অর্পন করার পর তিনি কেমন অনুভব করছেন জানতে চাইলে রাধাকৃষ্ণ বলেন, “সাধারণত পিতা দেখতে পছন্দ করেন যে, তার পুত্র খুব ভালোভাবেই আছেন, পিতার মত নয় বরং তার চেয়েও ভালভাবে। অনুরূপভাবে, যেহেতু আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পরিকরদের তৈরি করেছি তাই তাঁরা এখন আমার পুত্রের মতই।

খানিকটা থেমে তিনি পুনরায় বলেন, “যখন আমি দেখলাম যে কত সুন্দরভাবে ভগবানকে সবাই আরাধনা করছে, আমি তখন অত্যন্ত খুশি হই।” এই বলতে বলতে তাঁর বস্ত্রের একটি কোণা উপরের দিকে তুলে চোখ মুছতে লাগলেন।

তিনি কাঁদছিলেন। "আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, সবকিছু খুব সুন্দরভাবেই হয়েছে।" তাঁর এই অভিব্যক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

"ইতোপূর্বে অনেক বিগ্রহ তৈরি করেছি আমি, কিন্তু শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বিগ্রহ তৈরির পর আমি এখন বলতে পারি যে, 'স্থপতি' নামের যে উপাধি সেটি এখন আমার অর্জিত হয়েছে।" রাধাকৃষ্ণের শেষের এই উক্তিটির সঙ্গে নিশ্চিতভাবে ভক্তরাও সম্মত হবেন।

লেখক - ব্রজসখী দেবী দাসী

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার প্রক্রিয়া
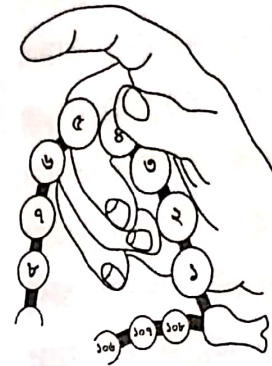
জপমালাটি ডান হতে নিন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মাঝখানে ধরুন (চিত্র দেখুন)। তর্জনীটিকে কলুষিত বিবেচনা করা হয়, তাই এটিকে জপমালায় ব্যবহার (বা স্পর্শ) করা হয় না। প্রধান গুটিটির পরবর্তী গুটিটি থেকে শুরু করুন। জপ করার পূর্বে, পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্রটি উচ্চারণ করুনঃ "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। (৩ বার)

এখন মহামন্ত্র জপ করুন **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**। তারপর পরবর্তী গুটিতে যান। এভাবে ১০৮ বার জপ করার পর আপনি পুনরায় প্রধান গুটিতে পৌঁছবেন এবং তখনই একমালা পূর্ণ হবে। এখন প্রধান গুটিটি অতিক্রম না করে মালাটি ঘুরিয়ে নিন এবং পুনরায় পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র উচ্চারণ করে পরবর্তী মালা শুরু করুন। জপ করার সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ফলের জন্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করা উচিত।

জপ অন্ততঃপক্ষে যথেষ্ট উচ্চস্বরে করা উচিত যাতে জপকারীর নিকটবর্তী লোকটি তা শুনতে পায়। জপ করার

সময় মহামন্ত্রের প্রতিটি শব্দ শ্রবণে মনোনিবেশ করুন। এই মনোনিবেশই হল মন্ত্র-ধ্যান এবং আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে শক্তিশালী। যদিও মনের ইতস্তত ভ্রমণ থামানো কঠিন কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, মহামন্ত্র এমনভাবে জপ করা উচিত যাতে প্রতিটি শব্দাংশ স্পষ্টভাবে শোনা যায়। পরবর্তী গুটিতে যান। জপ করার উৎকৃষ্ট সময় হল ভোর বেলা (সূর্যোদয়ের পূর্বে, ব্রাহ্মমুহূর্তের সময়) জপ যে কোন অবস্থায় করা যায়- বাসে, ট্রেনে, কাজে যাওয়ার সময় অথবা রাস্তায় হাঁটার সময়- কিন্তু দৈনন্দিন কার্যকলাপ শুরু করার পূর্বে, প্রতিদিনের নির্দিষ্ট সংখ্যক মালাজপ সকালবেলা ভোরে পূর্ণ মনোনিবেশের সাথে সম্পন্ন করা সর্বশ্রেষ্ঠ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে

ভক্তিবেদান্ত একাডেমী ফর কালচার এন্ড এডুকেশন (বেইস) হতে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ

- গল্পে উপদেশ- ১
- গল্পে উপদেশ- ২
- মন নিয়ন্ত্রণের কৌশল
- দিক্‌ভ্রান্ত ভালবাসা
- পূর্ণ জাগরণ
- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রন
- পরম পুরুষের যোগ
- জপ ধ্যান
- সময় ব্যাবস্থাপনা
- কিভাবে চিরকাল বাঁচতে পারি
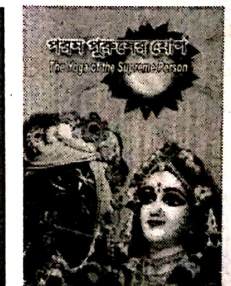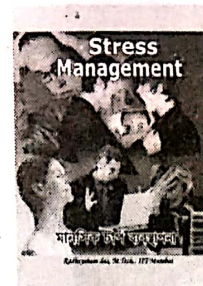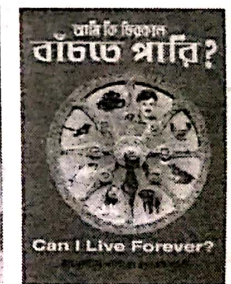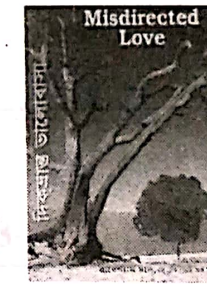
IYF পরিচালিত কোর্স সমূহ

Discover Your Self
(নিজেকে আবিষ্কার করুন)

Spiritual Scientist
(আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানী)
কোর্স-১

Positive Thinker
(ইতিবাচক চিন্তন) কোর্স-২

Self Manager
(আত্ম ব্যাবস্থাপক)
কোর্স-৩

Proactive leader
(স্থিতপ্রজ্ঞ নেতা) কোর্স-৪